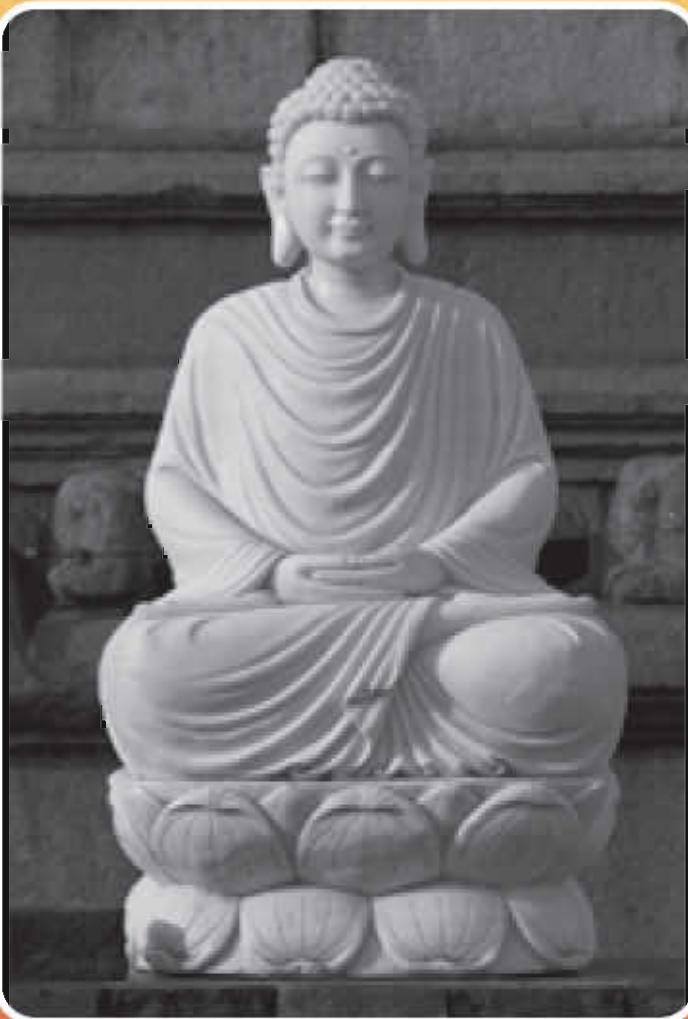


বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

ড. সুমন কাণ্ঠি বড়ুয়া

গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

উত্তরা চৌধুরী

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয় ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের দৃষ্টিকে প্রয়োগধর্মী করার লক্ষ্যে এখানে বিষয়বস্তুভিত্তিক চিত্র এবং অনুশীলনমূলক কাজ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি অধ্যয়নে শিক্ষার্থীরা ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। পরিণতিতে তারা গৌতম বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, নৈতিক ও সৎ জীবনের উপায়, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, সংস্কৃত ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলতে পারবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় নীতিবোধসম্পন্ন জীবন গড়তে যেমন সমর্থ হবে তেমনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সর্বজনীন কল্যাণবোধ, দেশপ্রেম ও সহনশীলতার চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের কাছে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের উৎস না হয়ে বাস্তবজীবনে সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার উৎকৃষ্ট সিঁড়ি হবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিরাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের জীবপ্রেম	১-১৩
দ্বিতীয়	বন্দনা	১৪-২২
তৃতীয়	শীল	২৩-২৯
চতুর্থ	দান	৩০-৩৭
পঞ্চম	সূত্র ও নীতিগাথা	৩৮-৫০
ষষ্ঠ	চতুরার্থ সত্য	৫১-৫৬
সপ্তম	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব	৫৭-৬৮
অষ্টম	চরিতমালা	৬৯-৮১
নবম	জাতক	৮২-৯২
দশম	বাহ্যাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান	৯৩-১০৩
একাদশ	বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান : রাজা বিষ্ণুসার	১০৪-১০৯

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের জীবন্তিম

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর ধর্মের অনুসারীদেরকে বৌদ্ধ বলা হয়। আমরা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। গৌতম বুদ্ধের বাল্য নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম। বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। ছোটবেলা থেকেই জীবের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমতাবোধ। ছোট-বড় সকল প্রাণীকে তিনি সমানভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর সেবায় ও আদরে অনেক প্রাণী সুস্থ হয়েছে এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহে গৌতম বুদ্ধের জীবন্তিমের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের জীবন্তিম সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা —

* বুদ্ধের জীবন্তিম ব্যাখ্যা করতে পারব।

* গৌতম বুদ্ধের জীবন্তিমের কাহিনী বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

গৌতম বুদ্ধের পরিচিতি

খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে সিদ্ধার্থ গৌতম কপিলাবস্তুর লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুন্দেশদন এবং মাতার নাম মহামায়া। তাঁরা শাক্য রাজের রাজা এবং রানি ছিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মাতা রানি মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন। তারপর সিদ্ধার্থের লালন-পালনের দায়িত্ব নেন রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি রানি মহামায়ার বোন ছিলেন। বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে সিদ্ধার্থের অপর নাম হয় গৌতম। শাক্যরাজ বৎশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি শাক্যসিংহ নামেও পরিচিত।

সিদ্ধার্থের জন্মের খবর শুনে অনেক জ্যোতিষী রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। তাঁরা শিশু সিদ্ধার্থের মধ্যে বত্রিশটি সুলক্ষণ দেখতে পান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ‘এই রাজকুমার গৃহে থাকলে রাজচক্রবর্তী রাজা হবেন, সন্ন্যাস জীবন ধারণ করলে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন।’ কিন্তু একমাত্র ঝুঁঁ অসিত বলেন, রাজকুমার মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন।

রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং রাজা শুন্দেশদনের অপরিসীম স্নেহ-মমতায় সিদ্ধার্থ ক্রমে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। রাজা রাজকুমারের শিক্ষার জন্য বহু শাস্ত্রবিদ পঞ্চিত নিয়োগ করেন। তিনি এঁদের নিকট নানা লিপিবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন। ক্রমে তিনি ঘোড়ায় চড়া, রথচালনা, অসি-চালনা, যুদ্ধকৌশল এবং অন্যান্য বিদ্যা শেখেন। রাজকুমারের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে গুরু বিশ্মিত হন। অন্নদিনের মধ্যে রাজকুমার সকল শাস্ত্র ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

রাজকীয় পরিবেশে রাজকুমার ক্রমে কৈশোরে উন্নীর্ণ হন। কিন্তু কৈশোর বয়স থেকেই রাজকীয় ভোগ-বিলাসে তিনি উদাসীন ছিলেন। প্রায়ই তাঁকে একাকী নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকতে দেখা যেত। রাজকুমারের

ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীনতা দেখে রাজা শুদ্ধোদন চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং জ্যেতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী অরণ করে অস্বস্তিতে দিনাতিপাত করতে থাকেন। ক্রমে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ঘোবনে পদার্পণ করেন। কিন্তু রাজা লক্ষ্য করলেন, যতই দিন যাচ্ছে কুমার ততই উদাসীন হয়ে যাচ্ছেন। তিনি রাজকুমারকে ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত রাখার জন্য সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোনো কিছুই রাজকুমারকে আকৃষ্ট করতে পারল না। অবশ্যে রাজা অমাত্যদের (মন্ত্রী) সঙ্গে পরামর্শ করেন। অমাত্যগণ রাজকুমারকে সৎসারমুখী করার জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। সঞ্চাহব্যাপী ঝাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের মধ্য দিয়ে যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। যশোধরা গোপাদেবী নামেও পরিচিত ছিলেন।

বাল্যকাল হতে সিদ্ধার্থের মনে যে বৈরাগ্যের সংশ্লেষণ হয়, ঘোবনে এসে তা আরো বৃদ্ধি পায়। রাজ-অন্তঃপুরের ভোগ-বিলাসের মধ্যেও সিদ্ধার্থের মনে শান্তি ছিল না। একদা তাঁর নগরভ্রমণের বাসনা হলো। রাজা ঘোষণা করে দিলেন, রাজকুমার নগরভ্রমণে যাবেন, পথ-ঘাট সব যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। নির্দেশ দিলেন, কোনো অসুন্দর দৃশ্য যেন রাজকুমারের দৃষ্টির মধ্যে না পড়ে। রাজার আদেশে রাজপথ পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত করা হলো। রাজকুমার নগর ভ্রমণে বের হলেন। সাজসজ্জা দেখে রাজকুমারের প্রথম মনে হলো জগতে দুঃখ, বেদনা, হতাশা নেই। কিছুদূর যাওয়ার পর রাজকুমার দেখলেন, এক জরাজীর্ণ দুর্বল বৃদ্ধ বক্রদেহে লাঠিতে ভর দিয়ে অতিকষ্টে পথ চলছে। সিদ্ধার্থ রথচালক ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ও কে?’ ছন্দক বললেন, ‘এক বৃদ্ধ’। সিদ্ধার্থ বললেন, ‘সকলেই কি বৃদ্ধ হবে, আমরাও?’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘সকলেই বৃদ্ধ হবে। এটাই জগতের নিয়ম।’ ছন্দকের কথা শুনে বিষণ্ণ মনে সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

পরদিন আবার নগরভ্রমণে বের হন। দ্বিতীয় দিন দেখতে পেলেন, ব্যাধিগ্রস্ত এক লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সিদ্ধার্থ ছন্দকের নিকট কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এই লোক ব্যাধিগ্রস্ত, সৎসারের যে কেউ যে কোনো সময় এ রকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে।’ সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

তৃতীয় দিন সিদ্ধার্থ আবার নগরভ্রমণে বের হলেন। দেখলেন চারজন লোক একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। পিছনে একদল লোক ত্রন্দন ও বিলাপ করছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ছন্দক বলেন, ‘জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সকলেই মৃত্যুর অধীন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষের অবশ্যস্তাবী পরিণতি।’ সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ মনে পুনরায় রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

চতুর্থ দিন রাজকুমার পুনরায় নগর ভ্রমণে বের হলেন। দেখলেন শান্ত, সৌম্য, গেরুয়া বসনধারী মুক্তি মস্তক এক সন্ন্যাসী ধীরগতিতে পথ চলেছেন। পরিচয় জানতে চাইলে ছন্দক বলেন, ‘ইনি সৎসার ত্যাগী বন্ধনহীন এক মুক্ত পুরুষ। ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে শান্তি অন্বেষণ করছেন।’ ছন্দকের কথা শুনে সিদ্ধার্থ খুশি হন এবং গৃহত্যাগের সংকল্প করে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।



সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শন

সিদ্ধার্থ বখন সহসার ভ্যাগের চিতায় অস্থির, তখন ধৰণ এল তাঁৱ এক পুত্ৰসন্তান জন্মগ্ৰহণ কৰেছে। ধৰণ শুনে তিনি বিচলিত হয়ে বলেন, ‘ঝাঙু জন্মেছে, বৰ্ধন জন্মেছে।’ তাই পুত্ৰেৱ নাম রাখা হলো রাম্ভ। পুত্ৰেৱ জন্মসংবাদ শুনে সিদ্ধার্থ দৃঢ় সংকলন কৰলেন, ‘আমি আৱ কালবিলম্ব না কৰে সকল বৰ্ধন ছিন্ন কৰে



নিদ্রামগ্নি গোপাদেবী ও পুত্র রাজুকে সিদ্ধার্থের শেষ দর্শন

শীত্রই বেরিয়ে পড়ব।' ক্রমে সিদ্ধার্থ ২৯ বছর বয়সে উপনীত হন। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা। রাজ-অত্থপুরোর সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সিদ্ধার্থ বিদায়কালে গোপাদেবী ও প্রাণপ্রিয় পুত্রকে শেষবারের মতো দেখার জন্য গোপার কক্ষে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, গোপা শিশুপুত্রকে ঝুকে জড়িয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন। একবার ইচ্ছা হলো শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদুর করবেন। পরক্ষণে তাবলেন, কোলে তুলে নিলে মা জেগে উঠবেন, তাহলে তাঁর ঘাওয়াই কথ হয়ে যেতে পারে। আসন্নবরণ করে তিনি গোপার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন।

অত্থপর রথচালক ছন্দককে নির্দেশ দিলেন অশ্ব কম্বককে প্রস্তুত করে নিয়ে আসতে। ছন্দক কম্বককে নিয়ে এলে উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে গৃহত্যাগ করেন। বৌদ্ধ পরিভাষায় সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগকে 'মহাভিনিক্ষমণ' বলা হয়। অনোমা নদী পার হয়ে সিদ্ধার্থ ছন্দককে বললেন, 'তুমি কম্বককে নিয়ে ফিরে যাও।' ছন্দক গৌতমকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মন কল্পে ব্যথিত হয়ে উঠল। প্রিয় অশ্ব কম্বক শোকে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। সিদ্ধার্থ পায়ে হঁটে বৈশালী নগরে পৌছলেন। যথি আলার কালাম, রামপুত্র রুদ্রকের কাছে যোগ, ধ্যান ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করলেন। তাতে তাঁর মন তৃষ্ণ হলো না। সেখান থেকে গোলেন রাজগৃহে। রাজগৃহ থেকে উরুবেশাৱ সেনানী গ্রামে। গ্রামটি নৈরঞ্জনা নদীৱৰ তীৰে অবস্থিত ছিল। এখানে অশ্বথ গাছের নিচে শুরু করেন কঠোৱ ধ্যান-সাধনা। ছয় বছর কাটল তাঁৰ ধ্যান-সাধনায়। অবশেষে বৈশালী পূর্ণিমা তিথিতে



বুদ্ধ পঞ্চবটীয় শিষ্যকে ধর্ম প্রচার করছেন

লাভ করেন বুদ্ধত্ব, জগতে তিনি খ্যাত হন বুদ্ধ নামে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পৌঁত্রিশ বছর। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সারনাথের অবিগতন মৃগদাবে পঞ্চবটীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম ধর্মপ্রচার করেন, যা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র নামে অভিহিত। সকল প্রাণীর দৃঃখ্যমুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য তিনি সুদীর্ঘ প্রায় পৌঁত্রিশ বছর তাঁর অমৃতময় ধর্মবাণী প্রচার করেন এবং আশি বছর বয়সে কুশিনারার শালবনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

চারি নিমিত্ত কী কী?

পাঠ : ২

গৌতম বুদ্ধ ও জীবপ্রেম

বৌদ্ধধর্মে জীবপ্রেমকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের জীবন জীবপ্রেমে সিক্ত। শুধু মানুষ নয়, ছোট-বড় সকল জীবের প্রতি বুদ্ধের অপরিসীম মমত্ববোধ ছিল। ‘সকল প্রাণী সুখী হোক’— বৌদ্ধদের অন্যতম কামনা। বুদ্ধের প্রতিটি ধর্মবাণীতে রয়েছে জীবপ্রেমের অমিয় আহ্বান। সকল বৌদ্ধকে পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। পঞ্চশীলের প্রথম শীলটি হচ্ছে — প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। এই শীলের মধ্যে শুধু প্রাণীর প্রতি গভীর মমত্ববোধই প্রকাশিত হয়নি, অধিকস্তু ছোট-বড় সকল প্রাণীকে রক্ষা করার প্রেরণাও রয়েছে। তাই বাধ, হরিণ, হাতিসহ বনের কোনো প্রাণীই শিকার বা হত্যা করা উচিত নয়। বুদ্ধের জীবপ্রেমের একটি কাহিনী নিচে তুলে ধরা হলো।

সিদ্ধার্থ ও রাজহাস্য

বুদ্ধের বাল্যজীবনের ঘটনা। একদিন সিদ্ধার্থ পুষ্প উদ্যানে একাকী বসে ছিলেন। এমন সময় সাদা মেঘখন্ডের মতো এক ঝাঁক রাজহাস পরম আনন্দে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি রাজহাস তীরবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় তাঁর সামনে পতিত হয়। শরাহত রাজহাসটি মৃত্যুবন্ধনায় ছটফট করছিল। সিদ্ধার্থ পরম যত্নে রাজহাসটিকে কোলে তুলে নিলেন। রাজহাসটির শরীর থেকে শর বের করলেন, ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়ে পরম মমতায় সেবা সুশূশ্য করে রাজহাসটিকে সুস্থ করে তুললেন। পরম সুখে রাজহাসটির দুচোখ দিয়ে অশু নির্ণিত হলো এবং সিদ্ধার্থের দিকে কৃতজ্ঞচিত্তে তাকিয়ে রইল। এমন সময় বুদ্ধের জ্ঞাতি আতা দেবদত্ত সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন,

‘শরবিদ্ধ রাজহাসটি আমার। আমিই তীর নিষ্কেপ করে রাজহাসটিকে ভূমিতে পতিত করেছি। আমার হাস আমাকে দাও।’

তখন মমতায় ভরা কঠে সিদ্ধার্থ বললেন,

‘ভাই দেবদত্ত! যে প্রাণরক্ষা করে প্রাণীর ওপর তারই অধিকার। যে প্রাণ হননে উদ্যত হয়, প্রাণীর ওপর তার অধিকার থাকতে পারে না। হাসটি মৃত নয়, আহত মাত্র। আমিই সেবা দিয়ে সুস্থ করে হাসটির জীবনরক্ষা করেছি। তাই হাসটি আমার। আমি এই শাক্যরাজ্য তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু হাসটি দিতে পারব না।’

এরূপ বলে সিদ্ধার্থ হাসটি আকাশে উড়িয়ে দিলেন।



ଶରାହତ ରାଜଇସକେ କୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥେର ସେବା

ଅନୁଶୀଳନମୂଳକ କାଣ୍ଡ

ଆହତ ରାଜଇସଟି କାର ? ତୋମାର ମତାମତ ଦାଓ ।

ପାଠ : ୩

ବୁଦ୍ଧର ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ପାଇଁ ‘ମେତ୍ତା’ ଶଦେର ବାଞ୍ଚା ଅର୍ଥ ହଛେ ମୈତ୍ରୀ; ଯାର ସମାର୍ଥକ ଶଦ ହଛେ ମିତ୍ରତା, ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରେମ, ଭାଲୋବାସା, ହିତଚିନ୍ତା, ପରୋପକାରିତା, ଶୁଭେଷା, ସୌହାର୍ଦ୍ୟ, ସୌଭଗ୍ୟବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି । ମୈତ୍ରୀ ମାନୁମେର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ସଂସ୍କାର । ଏଟି ହିସ୍ତା- ବିଦେଶେର ବିପରୀତ ଦିକ । ହିସ୍ତା- ବିଦେଶ ପରମତମର ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଓ ସୃଂଗର ଜନ୍ମ ଦେଇ । ମନେର ମଧ୍ୟେ ହିସ୍ତାର ଦାବାନଳ ଛଲେ । ଏତେ ମାନୁମେର ମନ ହିସ୍ତ ପଶୁର ଚୟେଓ ଭୟକର ହୟ । ଫଳେ ମେ ସେଫୋନୋ ଅନ୍ୟାୟ-ଅବିଚାର ଓ ଥାଣିହତ୍ୟାର ମତୋ ଧାରାପ କାଜ କରାତେଓ ହିଥାବୋଧ କରେ ନା । ମୈତ୍ରୀ ମାନୁମେର ମନକେ ଉଦ୍ଦାର, ଶାନ୍ତ ଓ ଈର୍ଧାମୁକ୍ତ ରାଖେ । ମୈତ୍ରୀ ମନ ସେକେ କ୍ରୋଧ, ହିସ୍ତା, ହୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ କରେ ଏବଂ ଅପରେର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଭାଲୋବାସା ଓ ମମ୍ତୁବୋଧ ଜାହାତ କରେ । ବୁଦ୍ଧ ବଲେଛେ, ‘ମୈତ୍ରୀ ଧାରା କ୍ରୋଧକେ ଜୟ କରିବେ, ସାଧୁତା ଧାରା ଅସାଧୁତାକେ ଜୟ କରିବେ, ତ୍ୟାଗ ଧାରା କୃପାକେ ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଧାରା ମିଥ୍ୟାବାଦୀକେ ଜୟ କରିବେ ।’ ବୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ବଲେଛେ, ‘ମା ସେମନ ତୀର ଏକମାତ୍ର ପୃତ୍ରକେ ନିଜେର ଜୀବନ ଦିଯେ ରକ୍ଷା କରେନ, ତେମନି ସକଳ

প্রাণীর প্রতি মেঢ়ী পোষণ করবে।’ নিম্নে বুদ্ধের মেঢ়ী প্রদর্শনের একটি কাহিনী তুলে ধরা হলো।

সিদ্ধার্থ গৌতম ও ছাগশিশু

গৃহত্যাগের পর একদিন সিদ্ধার্থ গৌতম রাজগহ থেকে বৈশালী যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে এক ছাগশিশুর করুণ কান্না তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এ সময় তিনি ছাগশিশুটি কোলে তুলে নিয়ে রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এদেরকে নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ রাখাল বলল,

‘এগুলো রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ছাগশিশু বলি দেওয়া হবে।’

পুত্রসন্তান কামনায় রাজা বিস্মিসার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তিনি ভেরি বাজিয়ে ঘোষণা করেন যে, রাজ্যে যত ছাগশিশু আছে সেগুলো যেন রাজপ্রাসাদে আনা হয়। রাখালের মুখে এ কথা শুনে শ্রমণ গৌতম যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ এতগুলো অবোধ প্রাণীর রক্তে প্লাবিত হবে যজ্ঞভূমি। তিনি তা মেনে নিতে পারেননি। রাজপ্রাসাদের সামনে একটি মন্দির। সেই মন্দিরের সামনে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরোহিতরা মন্ত্র পাঠ করছিলেন। ছাগশিশুর করুণ কান্নায় তাঁদের মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ চাপা পড়ে যায়। এ অবস্থায় কোলে ছাগশিশু নিয়ে মহাযজ্ঞস্থলে সিদ্ধার্থ গৌতম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে রাজা আনন্দিত হলেন। রাজা বললেন,

‘আমার কী সৌভাগ্য যে আমার অনুষ্ঠানে নবীন সন্ন্যাসীও অংশগ্রহণ করছেন।’

সিদ্ধার্থ গৌতম চারদিকে একপলক তাকিয়ে রাজাকে বললেন, ‘মহারাজ, আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।’ তখন রাজা বললেন, ‘আপনার প্রার্থনা আমাকে বলুন। আমি আপনার প্রার্থনা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।’

সিদ্ধার্থ গৌতম তখন বললেন, ‘আমি ছাগশিশুর প্রাণভিক্ষা চাই।’ রাজা বললেন, ‘পুত্র লাভের আশায় আমি ধর্মীয় বিধান অনুসারে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছি। এখানে সহস্র ছাগশিশু বলি দেওয়া হবে। আপনি আমার যজ্ঞ নষ্ট করবেন না।’ সিদ্ধার্থ গৌতম বললেন, ‘মহারাজ, আমি আপনার যজ্ঞ নষ্ট করতে চাই না। বিনা রক্তে যদি আপনার দেবতা তুষ্ট না হন তবে এ ছাগশিশুর পরিবর্তে আমাকে বলি দিন। এতে আপনার নরহত্যাজনিত পাপ হবে না। কারণ আমি বেছায় আত্মান করছি।’ গৌতম পুনরায় রাজা বিস্মিসারকে বললেন, ‘মহারাজ, শুনুন ওই ছাগশিশুর কান্না। পশুর পরিবর্তে মানুষ পেলে আপনার দেবতা আরো বেশি তুষ্ট হবেন। সুতরাং আমাকে বলি দিন। এতে যজ্ঞও হবে, ছাগশিশুরাও জীবন ফিরে পাবে।’ এ কথা বলে শ্রমণ গৌতম যৃপকাষ্ঠে বন্দী ছাগশিশুকে মুক্ত করে দিলেন এবং নিজেকে বলি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।



সিদ্ধার্থের জীবনের বিনিয়য়ে ছাগশিশুর মৃত্যু কামনা

এ দৃশ্য দেখে সবাই নিষ্ঠুর্য হয়ে গেল। পুরোহিতরা মন্ত্রপাঠ করে দিলেন। তখন রাজা বিশ্বসারের মনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। রাজা বললেন,

‘হে জ্ঞানতাপস! অহংকার ও আভিজ্ঞাত্যে আমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল। আগনি আজ আমাকে সত্যের পথ দেখালেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।’

এ বলে রাজা সকল ছাগশিশু ছেড়ে দিতে এবং যজ্ঞ বস্ত্রের আদেশ দিলেন। শুধু তা-ই নয়, তখন থেকে রাজা বিশ্বসার ও রাজ্যে চিরদিনের জন্য পশুবলি কর্ম করার নির্দেশ দেন।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

ছাগশিশুগুণে কীভাবে জীবন ফিরে গেল?

পাঠ : ৪

গৌতম বুদ্ধ ও অহিংসা নীতি

বুদ্ধ অহিংসবাদী ছিলেন। তাই বৌদ্ধধর্মকে অহিংসার ধর্ম বলা হয়। অহিংসা শব্দের সাধারণ অর্থ হলো হিংসা না করা। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘অহিংসা’ শব্দটির বিভিন্ন রকম অর্থ রয়েছে। বৌদ্ধধর্মতে অহিংসা শব্দের অর্থ হলো হিংসা না করা, কায়-মন-বাক্যে হিংসা বর্জন করা, কারো অনিষ্ট না করা, প্রাণহত্যা হতে বিরত থাকা, সকল জীবকে রক্ষা করা, মানবতা, কোমলতা, দয়া, করুণা প্রভৃতি প্রদর্শন করা। বুদ্ধ বলেছেন, ‘শুধু নিজেকে ভালোবাসলে হবে না, ভালোবাসতে হবে সকল জীবকে।’ বুদ্ধ এ নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এখানে একটি অহিংসা বিষয়ক কাহিনী তুলে ধরা হলো।

বৃদ্ধা মা ও বউ

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে কাত্যায়নী নামে একজন মহিলা বসবাস করতেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি ছিল খুবই আদরের। তিনি পরম মমতায় তাকে লালন-পালন করেন। মায়ের বয়স হলে ছেলেটিও তাঁর সেবা ও যত্ন করত। মায়ের বিপদ-আপদকে নিজের বিপদ-আপদ মনে করত। বলা যায়, খুব যত্নসহকারে মায়ের দেখাশোনা করত। এভাবে মা ও ছেলে দুজনই সুখে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। একদিন মা মনে করলেন, আমি আর কত দিন বাঁচব- এ তেবে এক সুন্দরী মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিয়ের পরেও ছেলে আগের মতোই তার মায়ের সেবা- যত্ন করতে থাকে। মায়ের প্রতি এ ধরনের ভালোবাসা দেখে সুন্দরী বউয়ের মনে খুব হিংসা উৎপন্ন হলো। কিন্তু হিংসা স্বামীকে দেখাতে পারত না। এভাবে স্ত্রীর হিংসা দিন দিন আরো বাড়তে থাকে। হিংসাবশত স্বামীর সাথে সে প্রায়ই বাগড়া-বিবাদ করত। একদিন বাগড়ার সময় স্ত্রী স্বামীকে বলল, ‘তোমার মায়ের সাথে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার মাকে চলে যেতে বলো, নতুনা আমি চলে যাব।’

ছেলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য বলল, ‘মা! তুমি আমার স্ত্রীর সাথে রোজই বাগড়া করো। যেদিকে তোমার মন চায় চলে যেতে পারো।’ মনের দুঃখে মা দূর সম্পর্কের একজন আত্মায়ের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিন-রাত পরিশ্রম করার বিনিময়ে মা নিজের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিলেন।

এদিকে বউয়ের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। নাতি হয়েছে শুনে মা খুবই খুশি হলেন। তবে মনে ব্যথা পেলেন। তিনি ভাবলেন : আমার আদরের নাতিকে আমি আজও দেখতে পেলাম না। বিনা অপরাধে আমি ঘরছাড়া। পৃথিবীতে কি ধর্ম বলতে কিছুই নেই? এরপ বলে মা আঙ্কেপ করলেন। মা স্থির করলেন ধর্মপূজা করবেন। থালায় সাজালেন নানাবিধি ফুল, পানি, সুগন্ধি আর প্রদীপ। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র অসহায় মায়ের করুণ অবস্থা দেখলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তিনি উপস্থিত হলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, ‘বুড়িমা, তুমি কী করছ?’

বুড়িমা উত্তর দিলেন, ‘আমি ধর্মপূজা করছি।’

তখন বুড়িমা ছেলে ও বউয়ের সব কথা খুলে বললেন।

ইন্দ্র বললেন, ‘মা, তুমি দুঃখ করো না। খুব শীত্রাই তোমার বট ও ছেলের মনের পরিবর্তন হবে। কারণ তাদেরও একটি ছেলে হয়েছে। তুমি ঘরে যাও। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।’

দেবরাজ ইন্দ্রকে মা ভদ্রি সহকারে প্রণাম জানিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা হলেন। এদিকে তাঁর বউয়ের যে সহিংস মনোভাব ছিল, তা আর নেই। যে ক্রোধ দেখাত, সেগুলো আর নেই। বউয়ের মন দমিত হলো। নিজের হিংসাকে সে প্রশমিত করল। পথের অর্ধেক যেতে না যেতেই মা দেখলেন ছেলে আর বট নাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি বৃন্দ মায়ের কোলে নাতিকে তুলে দিল। ওরা দুজনে বলল ‘মা, দেখ তোমার নাতি।’ বট তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। মাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেল। নিজের হিংসা ত্যাগ করে আবার সকলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

অনুশীলনমূলক কাজ
 ‘অহিংসা’ শব্দের অর্থ লেখ।
 হিংসার কুফল বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. সিদ্ধার্থের অপর নাম ছিল ।
২. সিদ্ধার্থের জন্মের খবর শুনে অনেক রাজপ্রাসাদে আগমন করেন।
৩. যশোধরা নামেও পরিচিত ছিল।
৪. বৌদ্ধধর্মে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
৫. ছোট-বড় সকল জীবের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ ছিল।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
<ol style="list-style-type: none"> ১. পুরাহিতরা মন্ত্রপাঠ ২. শরাহত রাজহাস্যটি ৩. ছন্দকের কথা শুনে ৪. রাজপথ পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত করা হলো ৫. রাজ-অন্তঃপুরের ভোগ-বিলাসের 	<p>সিদ্ধার্থ খুশি হলেন। মধ্যেও সিদ্ধার্থের মনে শান্তি ছিল না। বৃন্দ করে দিলেন। রাজার আদেশে। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল।</p>

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সিদ্ধার্থকে গৌতম বলা হয় কেন?
২. সিদ্ধার্থ কী কী বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন?
৩. বৃন্দ কোথায় ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জীবপ্রেম সম্পর্কিত ‘সিদ্ধার্থ ও রাজহংস’ কাহিনীটি বর্ণনা কর।
২. বুদ্ধের অহিংসা নীতিবিয়য়ক গঠাটি ব্যাখ্যা কর।
৩. সিদ্ধার্থ গৌতম ও ছাগশিশুর কাহিনীটি নিজের ভাষায় লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাখিটিকে খেলার ছলে কে আঘাত করেছিলেন?

- | | |
|--------------|------------|
| ক. সিদ্ধার্থ | খ. রাহুল |
| গ. দেবদত্ত | ঘ. পুরোহিত |

২. রাজা বিষিসার কেন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন?

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ক. পুত্রসন্তান লাভের প্রত্যাশায় | খ. ছাগশিশুকে রাজপ্রাসাদে আনার জন্য |
| গ. রাজ্য বিস্তার করার জন্য | ঘ. রাজ্যের মঙ্গল কামনার জন্য |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিপন বড়ুয়া ও সুমন বড়ুয়া দুজন বৈমাত্রেয় তাই। রিপন বড়ুয়ার স্ত্রী গুণবত্তী মহিলা। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। তাই সুমন বড়ুয়ার স্ত্রী তার প্রতি বিভিন্নভাবে বিকল্প আচরণ করতে শুরু করে।

৩. সুমন বড়ুয়ার স্ত্রীর একান্ত আচরণকে বৌদ্ধ পরিভাষায় কী বলা যায়?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক. হিংসাত্মক মনোভাব | খ. শত্রুতা মনোভাব |
| গ. রাগী মনোভাব | ঘ. দ্বেষের মনোভাব |

৪. সুমন বড়ুয়ার স্ত্রীর আচরণিক পরিবর্তন বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা—

- i. জীবের প্রতি অহিংসা মনোভাব পোষণ করা
- ii. সব সময় কৃশল চিন্তা করা
- iii. প্রাণীর প্রতি গভীর মেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. বিজয় চাকমা শহরে যাওয়ার সময় দেখলেন এক পথশিশু গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তিনি হাসপাতালে নিয়ে শিশুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে শিশুটি সুস্থ হলে তাকে মায়ের হাতে তুলে দেন।

- ক. সিদ্ধার্থ চতুর্থ দিন নগর ভ্রমণে গিয়ে কী দেখলেন ?
- খ. ছেলে ও বউয়ের মনোভাব কীভাবে পরিবর্তন হলো ?
- গ. বিজয় চাকমার আচরণে সিদ্ধার্থের কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত গুণের ফলে বিজয় চাকমার মন থেকে কী দূরীভূত হতে পারে ? বিশ্লেষণ কর।

২.

ঘটনা-১

রতন বড়ুয়ার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রদেশীয় ভাষ্টে দেশনা করলেন—জগতের সবকিছুই অনিত্য ও দুঃখময়। জন্মের শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না।

ঘটনা-২

জয় চাকমা রাজবনবিহারে গিয়ে ভিক্ষু-সংস্কেত পিঞ্চাচরণ দেখে ও সূত্রপাঠ শুনে মুগ্ধ হলেন। নিজের জীবনের পরিবর্তন উপলব্ধি করেন। এক পর্যায়ে সংসারের প্রতি তাঁর অনীহা এল। তিনি মা-বাবার অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

- ক. বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ গৌতম কী লাভ করলেন ?
- খ. সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করতে হয় কেন ?
- গ. ঘটনা-১-এর উদ্ধৃতাঙ্কটি পাঠ্যবইয়ের চারি নিমিত্তের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ঘটনা-২-এ জয় চাকমার অনুসৃত পথের ফলাফল ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ବନ୍ଦନା

‘ବନ୍ଦନା’ ବୌଦ୍ଧଦେର ନିତ୍ୟ ପାଶନୀୟ ଏକଟି କର୍ମ । ବନ୍ଦନା ହଳେ ଗୁଣରାଶି ଅରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଶେଷ । ଧାର୍ମିକ, ଜୀବୀ ଏବଂ ପୁଣୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବନ୍ଦନାର ଯୋଗ୍ୟ । ମାନବଚିନ୍ତା ସବସମୟ ଲୋଭ-ଦ୍ୱେ-ମୋହାଦି ପାପେ ଲିଙ୍ଗ ଥାକେ । ବନ୍ଦନା ମାନୁଷେର ମନେର କାଳିମା ବିଦୂରିତ କରେ ଏବଂ ତ୍ରିରତ୍ନର ପ୍ରତି ଧର୍ମା ଆଶ୍ରତ କରେ । ବୁଦ୍ଧ ବଲେହେନ, ଧର୍ମାର ଦୀର୍ଘ ମହାଶ୍ଵାବନ ଅତିକ୍ରମ କରା ଯାଯ । ମାନବଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧିର ଜନ୍ୟ ମାତୃଦୂଷ ଯେମନ ଖୁବଇ ଦରକାର, ତେମନି ଚିନ୍ତର ବିକାଶ ଜାତ କରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବନ୍ଦନା କରା ଆବଶ୍ୟକ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ବନ୍ଦନାର ସୁଫଳ, ନିୟମାବଳି, ଦର୍ଶନାତ୍ମକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମହାଶ୍ଵାନ ଏବଂ ମାତୃ-ଶିତ୍ତ ବନ୍ଦନା ସଂକଳନ ପଡ଼ିବ ।



ବନ୍ଦନାବିତ ଉପାସକ ଉପାସିକାବିନ୍ଦ

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷେ ଆମରୀ-

- * ବନ୍ଦନା ସଂକଳନ କରିବାକୁ ପାରିବ ।
- * ବନ୍ଦନା କରାର ନିୟମାବଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପାରିବ ।
- * ବନ୍ଦନାର ସୁଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପାରିବ ।

পাঠ : ১

বন্দনা ও বন্দনার সুফল

বন্দনা

‘বন্দনা’ শব্দের বিভিন্ন রকম অর্থ রয়েছে। যেমন : প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, আনুগত্য স্বীকার, পূজা, প্রেম, শ্রদ্ধা নিবেদন, অভ্যর্থনা, আরাধনা, উপাসনা, স্তুতিগান ইত্যাদি। মূলত গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের গুণরাশির স্তুতি করাই হচ্ছে বন্দনা।

‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ মহাজ্ঞানী। তিনি ছিলেন মানবপুত্র। তাঁকে মহাজ্ঞানীর বলা হয়। তাছাড়া তিনি অসীম গুণরাশির অধিকারী ছিলেন। তাই আমরা বুদ্ধের বন্দনা করি। বন্দনার উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধের অসীম গুণের স্তুতি বা প্রশংসন করা। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে নিজের জীবনকে সুন্দর করা।

আমরা শুধু বুদ্ধকে বন্দনা করি না। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মকে বন্দনা করি। বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত মহান সঙ্গকেও বন্দনা করি। আমরা বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনা করি। সপ্ত মহাস্থানকে বন্দনা করি। বৈধিবৃক্ষকে বন্দনা করি। চৈত্যকে বন্দনা করি। বিভিন্ন তীর্থস্থান ও পবিত্র স্থানকে বন্দনা করি। মা-বাবার বন্দনা করি। বন্দনা বৌদ্ধদের নিত্যপালনীয় কর্ম।

বন্দনা বৌদ্ধ বিহারে কিংবা বাড়িতে বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে করা যায়। বিহার যদি বাড়ির কাছে হয় তাহলে বিহারে গিয়ে বন্দনা করলে ভালো হয়। আর বিহার যদি দূরে হয়, সে ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিহারে গিয়ে বন্দনা করা ভালো। মা-বাবা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বৃক্ষ-বাস্তবদের নিয়ে বন্দনা করা মজাল। এ ধরনের বন্দনাকে সমবেত বন্দনা বলা হয়। সমবেত বন্দনার মাধ্যমে পারম্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়। মায়া-মমতা বৃদ্ধি পায়। সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব সুদৃঢ় হয়।

বন্দনার সুফল

মানবজীবনে বন্দনার প্রভাব অপরিসীম। বন্দনার সুফল অনেক। বন্দনার মাধ্যমে মন পবিত্র হয়। পুণ্য লাভ হয়। চিন্ত শুধু হয়। অশান্ত মন শান্ত ও সংযত হয়। লোভ, দেষ এবং মোহ দূরীভূত হয়। অকুশল ও অন্যায় কাজ করার ইচ্ছা জাগে না। মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত হয় এবং সত্য কথা বলতে উৎসাহী হয়। মনে সৎ চিন্তা আসে। তালো কাজে উৎসাহ আসে। ধৈর্য ও মৃতিশক্তি বৃদ্ধিপায়। অপরের মজাল করার ইচ্ছা জাগে। উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। ইহলোক এবং পরলোকে সুখ লাভ হয়। বন্দনার মাধ্যমে হৃদয়ে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। তাই সুন্দর জীবন গঠনের জন্য প্রতিদিন বন্দনা করা উচিত।

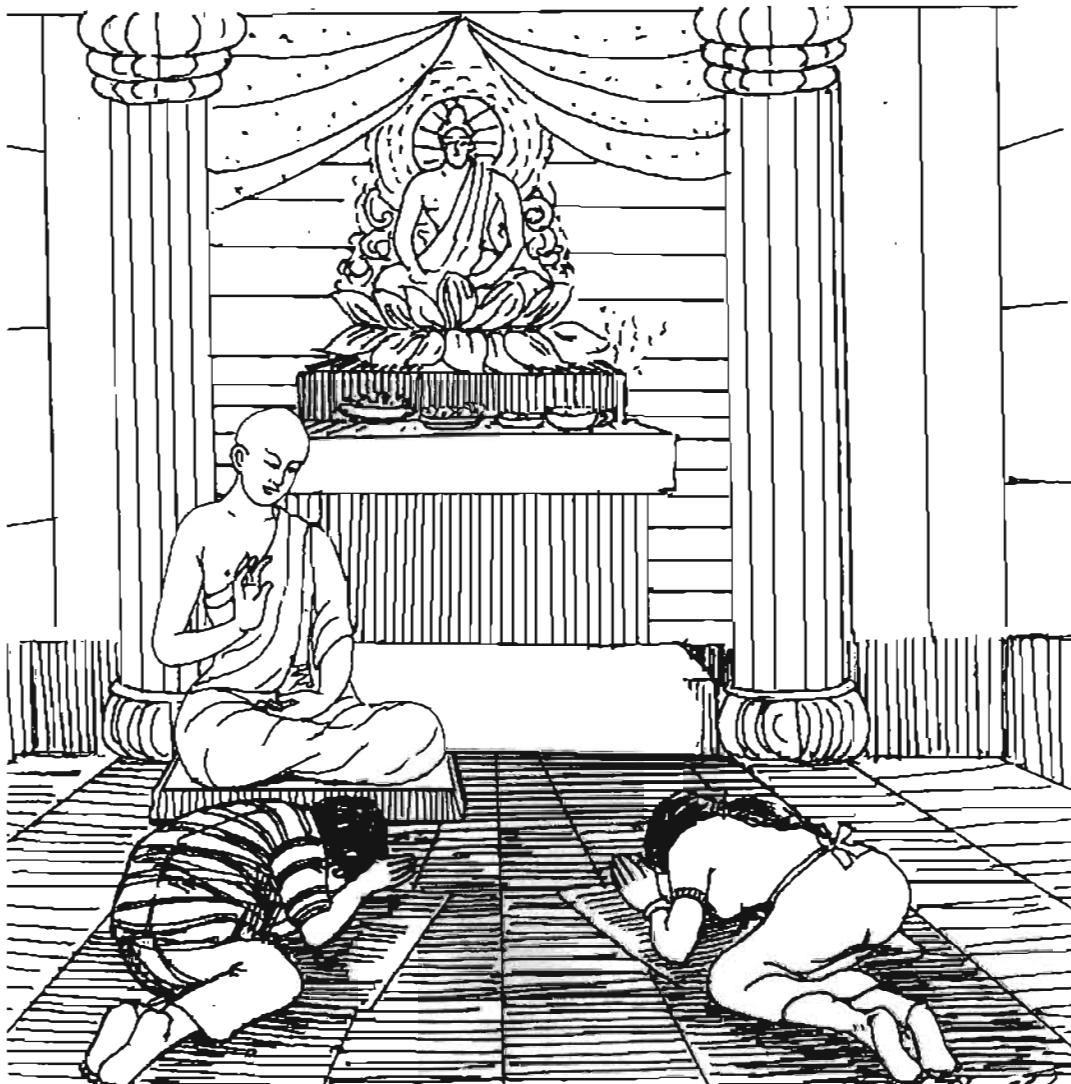
অনুশীলনমূলক কাজ

বন্দনা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

পাঠ : ২

বন্দনার নিয়মাবলি

বন্দনা করার আগে এবং বন্দনা করার সময় বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। যেমন : বন্দনার আগে ভালো করে মূখ, হাত ও পা ধূয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হয়। এতে দেহ ও মন পবিত্র হয়। পবিত্র দেহমনে বন্দনা করলে একাঞ্চতা বৃদ্ধি পায়। বন্দনার সময় বুদ্ধমূর্তি কিংবা বুদ্ধের ছবির সামনে ইটু তেঙ্গে বসতে হয়। তারপর দুই হাতের তাণ্ডু যুক্ত করে ঘনোযোগ সহকারে সুর করে বন্দনাগাথা আবৃত্তি করতে হয়। আবৃত্তি স্পষ্ট হওয়া উচিত। প্রত্যেক বন্দনাগাথা আবৃত্তি করার পর ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে শৃঙ্খা সহকারে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।



বালক-বালিকা প্রণাম নিবেদন করছে

এখন বুদ্ধের দন্তধাতু, সপ্ত মহাস্থান এবং মাতৃ-পিতৃ বন্দনা শিখব।

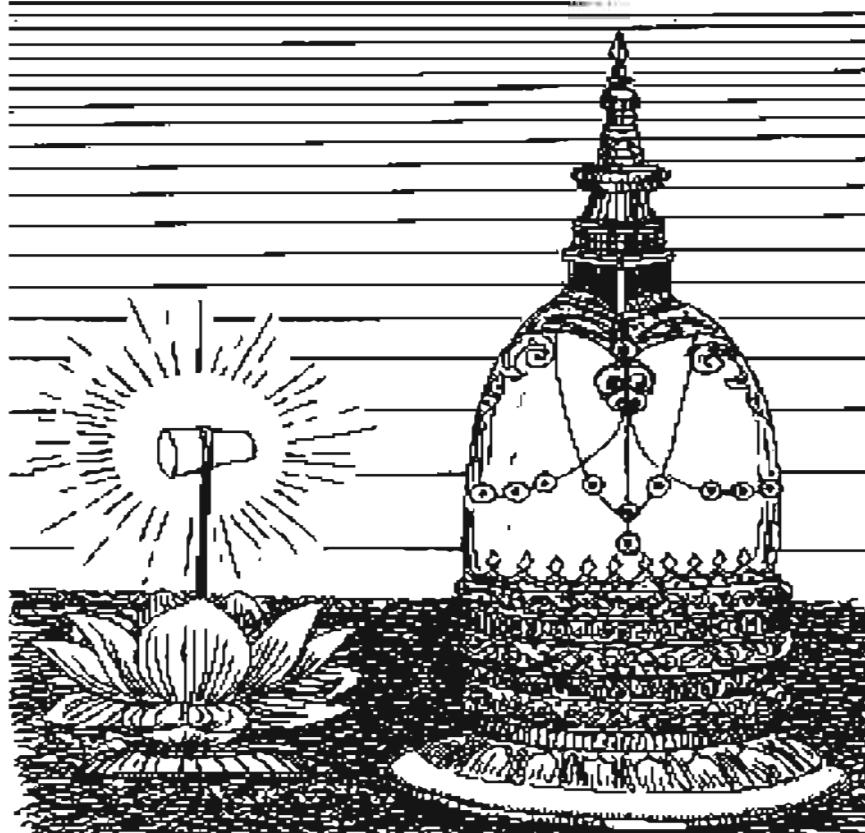
পাঠ : ৩

বুদ্ধের দণ্ডধাতু বন্দনা

বুদ্ধের বিভিন্ন অধিধাতু বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। দণ্ডধাতু তন্মধ্যে অন্যতম। চারটি স্থানে বুদ্ধের দণ্ডধাতু যত্নসহকারে রাখিত আছে বলে জানা যায়। দণ্ডধাতু বন্দনার পালি গাথাটি নিম্নরূপ :

একা দাঠা তিদসপুরে, একা নাগপুরে অবু
 একা গাঞ্চার বিসয়ে, একাসি পুন সীহলে,
 চতসুসো তা মহাদাঠা নিবান রসদীপিকা
 পুজিতা নরদেবেহি, তাপি বন্দামি ধাতুযো।

বাঞ্ছা অনুবাদ : বুদ্ধের একটি দণ্ড ত্রিদশালয়ে, একটি নাগলোকে, একটি গাঞ্চার রাজ্যে, একটি সিংহল দ্বীপে রয়েছে। নির্বাণ রস প্রদানকারী এ চারটি মহাদণ্ড নর ও দেবগণের ধারা পুজিত। আমিও সেই চার দণ্ডধাতুকে ভক্তিসহকারে বন্দনা করছি।



পাত্রে রাখিত বুদ্ধের দণ্ডধাতু

অনুলীপনমূলক কাজ

বুদ্ধের দণ্ডধাতু বন্দনাটি সমবেতভাবে আবৃত্তি কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের পাশে সাতটি স্থানে উন্পঞ্চাশ দিন অবস্থান করেন। সেসময় তিনি কখনো ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কখনো পদচারণ করেছেন। কখনো তাঁর উঙ্গুবিত নবধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। বোধিবৃক্ষের চারিপাশে এ রকম সাতটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সাতটি স্থানকে সপ্ত মহাস্থান বলা হয়। সপ্ত মহাস্থান হলো :

বোধিপালঙ্ক : বুদ্ধ যে আসনে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন তাকে বোধিপালঙ্ক বলা হয়।

অনিমেষ স্থান : বোধিপালঙ্ক থেকে কিছুটা উত্তর-পূর্ব কোণে অনিমেষ স্থান অবস্থিত। অনিমেষ স্থানে বসে বুদ্ধ সাত দিন ধরে এক পলকে বোধিবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। এজন্য এ স্থান অনিমেষ চৈত্য নামে পরিচিত।

চৎক্রমণ স্থান : বোধিপালঙ্ক ও অনিমেষ স্থানের মাঝখানে যে বেদিটি দেখা যায়, তা চৎক্রমণ (পদচারণ) স্থান নামে অভিহিত। বুদ্ধ এখানে চৎক্রমণ করেছিলেন বলে এরূপ নামকরণ হয়।

রাত্নঘর : বোধিপালঙ্কের সোজা উত্তর-পশ্চিম পাশের সামান্য দূরে রাত্নঘর স্থান অবস্থিত। বুদ্ধ এ স্থানে বসেই ধ্যান করেছিলেন।

অজপাল ন্যাষ্ঠোধ : এটি বোধিপালঙ্কের সোজা পূর্বদিকে এবং অনিমেষ স্থানের কিছু দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। ছাগল পালকেরা এ বৃক্ষের নিচে বসত বলেই এটি অজপাল বৃক্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে। বুদ্ধ এ স্থানে ধ্যান করতেন।

মুচলিন্দ স্থান : বোধিপালঙ্কের দক্ষিণ-পূর্বে এটি অবস্থিত। এখানে নাগরাজের বসবাস ছিল। মুচলিন্দ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করার সময় নাগরাজ তাঁর দেহ দিয়ে বুদ্ধকে বেষ্টন করে মশা-মাছি, বাড়-বৃষ্টি প্রভৃতি থেকে রক্ষা করেছিলেন।

রাজায়তন স্থান : বোধিপালঙ্কের সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে এবং মুচলিন্দের উত্তর পাশে এটির অবস্থান। রাজায়তন নামে এক ধরনের পার্বত্য বৃক্ষ ছিল বলেই এটি রাজায়তন স্থান নামে পরিচিত। এখানেও বুদ্ধ সাত দিন যাবৎ ধ্যান করেন।

বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই সপ্ত মহাস্থান বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। তাই বৌদ্ধরা একাগ্রাচিন্তে এই সপ্ত মহাস্থানকে বন্দনা নিবেদন করে। সপ্ত মহাস্থান বন্দনাগাথাটি নিম্নরূপ:

পঠমং বোধিপলাঙ্কং, দুতিযং অনিমিসম্পি চ

ততিযং চক্রমণং সেট্টং, চতুর্থং রতনঘরং

পঞ্চমং অজপালং, মুচলিন্দং ছত্রমং

সপ্তমং রাজায়তনং, বন্দে তৎ বোধিপাদপং।

বাংলা অনুবাদ : প্রথম বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ স্থান, তৃতীয় চৎকুমণ স্থান, চতুর্থ রতনঘর স্থান, পঞ্চম অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, ষষ্ঠি মুচলিন্দ মূল, সপ্তম রাজায়তনসহ বোধিবৃক্ষকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করছি।

অনুশীলনমূলক কাজ
সাতটি মহাস্থানের নাম বল।

পাঠ : ৫

মাতৃ-পিতৃবন্দনা

মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততির নিকট পরম পূজনীয়। মাতা-পিতা না থাকলে আমরা এই অপরূপ পৃথিবীর সৌন্দর্য কখনো দেখতে পেতাম না। স্নেহময়ী মাতা পুত্র-কন্যাদের দশ মাস গর্ভে ধারণ করে সীমাইন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। তারপর সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখান। পিতা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ এবং পরম মায়া-মমতায় লালন-পালন করেন। পিতা-মাতা সব সময় সন্তান-সন্ততির মজাল কামনা করেন। এ মহান হিতকামী মাতা-পিতাকে বৌদ্ধরা শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দনা জ্ঞাপন করেন। নিচে মাতৃ-পিতৃ বন্দনাগাথা দেওয়া হলো :

মাতৃ বন্দনা
কস্তান কাযে বুধিরৎ থীরৎ যা সিনেহ পুরিতা
পায়েত্তা মৎ সৎবড়চেসি বন্দে তৎ মম মাতরৎ।

বাংলা অনুবাদ : যে জননী রক্তসংঘাত স্নেহসিঙ্গ স্তন্য পান করিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন, সেই মমতাময়ী মাতাকে আমি বন্দনা করছি।

পিতৃ বন্দনা
দয়ায পরিপুণোব জনকো যো পিতা মম
পোসেসি বুদ্ধিং কারেসি বন্দে তৎ পিতরৎ মম।

বাংলা অনুবাদ : দয়ায পরিপূর্ণ যে পিতা আমাকে ভরণ-পোষণ করেছেন এবং আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বিকশিত করেছেন, সেই পিতাকে আমি বন্দনা করছি।

অনুশীলনমূলক কাজ
মাতৃ-পিতৃ বন্দনা আবৃত্তি কর (দলীয় কাজ)।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বন্দনায় হৃদয়েজাগ্রত হয়।
২. তিনিগুণরাশির অধিকারী ছিলেন।
৩. বুদ্ধ প্রবর্তিতবন্দনা করি।
৪. মা-বাবা সত্তান-সন্ততির নিকট পরম।
৫. বুদ্ধের বিভিন্ন অস্থিধাতু বৌদ্ধদের নিকট অতি।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে	বন্দনা করলে একাগ্রতা বাঢ়ে।
২. মা-বাবা সব সময়	স্পষ্ট হওয়া উচিত।
৩. পবিত্র দেহ-মনে	দন্তধাতু বন্দনা করি।
৪. আবৃত্তি	পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়।
৫. আমরা বুদ্ধের	সত্তান-সন্ততির মজাল কামনা করেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বন্দনা বলতে কী বোঝা?
২. বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনাটি বাংলায় লেখ।
৩. সমবেত বন্দনা বলতে কী বোঝা?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বন্দনার সুফলসহ বন্দনার নিয়মাবলি আলোচনা কর।
২. মাত্ৰ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনা বাংলা অনুবাদসহ আলোচনা কর।
৩. সপ্ত মহাস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ কী?

ক. জ্ঞানী
গ. লৌকিক জ্ঞান

খ. মহাজ্ঞানী
ঘ. সাধারণ জ্ঞান

২. মানবজীবনে বন্দনার প্রভাব অপরিসীম, কারণ এতে—

- i. মায়া-মমতা বৃদ্ধি পায়
- ii. মন পরিত্র হয়
- iii. পুণ্য সংগ্রহ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাতন বড়ুয়া পরিবার-পরিজন নিয়ে আবাটী পূর্ণিমায় বিহারে গিয়ে প্রথমে বুদ্ধপূজা করেন। এরপর ভগ্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একসাথে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন।

৩. রাতন বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডকে কোন ধরনের বন্দনা বলা যায়?

- | | | | |
|----|-----------------|----|----------------------|
| ক. | সমবেত বন্দনা | খ. | একক বন্দনা |
| গ. | দন্তধাতু বন্দনা | ঘ. | সপ্ত মহাস্থান বন্দনা |

৪. বৌদ্ধধর্ম অনুসারে উক্ত কর্মের ফলাফল স্বরূপ—

- i. পারম্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়
- ii. বিন্দুশালী হওয়া যায়
- iii. সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |



ରାଜ୍ୟାୟତନ ବୃକ୍ଷେର ନୀଚେ ଧ୍ୟାନରତ ଅବସ୍ଥାଯ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ

ସୁଜଳଶୀଳ ଅଧ୍ୟେ

১. ক. বুদ্ধের কংষটি মহাদণ্ড ধাতু নর ও দেবগণের দ্বারা পূজিত ?
খ. 'রাজায়তন' নামকরণের কারণ লিখ।
গ. চিত্রে প্রদর্শিত বুদ্ধের অবস্থান সম্ম মহাস্থানের কোনটি নির্দেশ করে ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উচ্চীগতে উল্লেখিত স্থানটির আলোকে বন্দনার সুফল ব্যাখ্যা কর।

২. প্রত্যয় বদ্যয়া ষষ্ঠি শ্রেণির ছাত্র। সে ধূব তোরে শুম ধেকে উঠে বাগানে ফুল তোলে। ফুলগুলো বুদ্ধের মূর্তি বা ছবির সামনে রেখে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সম্ভ্যা হলে সে বুদ্ধের সম্মুখে মোমবাতি ও ধূপ দিয়ে পূজা করে। তার আচরণে সবাই মুগ্ধ।

ক. রত্নস্থান কোথায় অবস্থিত ?
খ. মা-বাবাকে কেন শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা করা উচিত ?
গ. প্রত্যয় বদ্যয়ার আচরণকে বৌদ্ধ পরিভাষায় কী বলা যায় ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত আচরণে প্রত্যয় বদ্যয়া ইহলোক ও পরলোকে কী ফল তোল করবে ? ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

শীল

বৌদ্ধধর্মে নিয়ম ও শূঙ্খলার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শীল নিয়ম-শূঙ্খলার ভিত্তি। তাই বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের শীল পালন করা একান্ত কর্তব্য। বৌদ্ধশাস্ত্র গৃহী ও ভিক্ষুদের বিভিন্ন রকম শীল পালনের নির্দেশ আছে। সুন্দর ও পবিত্র জীবন গঠনের জন্য শীল পালন করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমরা নিত্যপালনীয় শীল, শীল গ্রহণের নিয়মাবলি এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * শীল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- * শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় পঞ্চশীল বলতে পারব।
- * পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ : ১

শীল পরিচিতি

‘শীল’ শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বত্বাব বা চরিত্র। শীলের আরো অর্থ আছে। যেমন : নিয়ম, নীতি, সংযম, সদাচার, আশ্রয়, শূঙ্খলা ইত্যাদি। কার্যিক, বাচনিক ও মানসিক সংযমকে শীল বলা হয়। নৈতিক জীবন গঠনের জন্য শীল পালন অপরিহার্য। গৌতম বুদ্ধ মানুষের চরিত্র সুন্দর করার জন্য শীল পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত শীল পালনের মাধ্যমে আমরা নৈতিকতা অনুশীলন করতে পারি। যাঁরা শীল পালন করেন, তাঁদেরকে বলা হয় শীলবান।

বৌদ্ধধর্মে নানা রকম শীল রয়েছে। তার মধ্যে পঞ্চশীল গৃহীরা পালন করেন। যাঁরা উপোসথ গ্রহণ করেন তাঁরা অষ্টশীল পালন করেন। তাই অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। শ্রমগংগণ দশশীল পালন করেন। এজন্য দশশীলকে প্রব্রজ্যশীল বলা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

‘শীল’ শব্দের অর্থ লেখ

পাঠ : ২

নিত্যপালনীয় শীল

যে শীলগুলো প্রতিদিন পালন করতে হয়, সেগুলোকে নিত্যপালনীয় শীল বলা হয়। পঞ্চশীল নিত্যপালনীয় শীল। এগুলো পালনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় বা স্থান নেই। সব সময় সর্বত্র পালন করা যায়।

পঞ্চশীলের প্রথম শীলটি প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। প্রাণিহত্যা করলে জন্ম-জন্মান্তরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। প্রত্যেকে নিজের জীবনকে ভালোবাসে। তাই কোনো প্রাণীকে আঘাত এবং হত্যা করা উচিত নয়। প্রথম শীলটি দ্বারা কেবল প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা বোবায় না। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকার শিক্ষাও দেয়। এই শীলটি ছোট-বড়, হীন-উভয়, দৃশ্য-অদৃশ্য

সকল প্রাণিকে রক্ষা করতে উদ্বৃদ্ধ করে। দ্বিতীয়টি চুরি বা অদন্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। চুরি একটি সামাজিক অপরাধও বটে। চুরি করলে সাজা এবং দণ্ড ভোগ করতে হয়। সুনাম নষ্ট হয়। পরিবারে দুর্ভোগ নেমে আসে। তাই চুরি বা অদন্ত বস্তু গ্রহণ করা থেকে সকলের বিরত থাকা উচিত। শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীর বই, খাতা, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি না বলে গ্রহণ করা অনুচিত। পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীলটি মানুষকে কেবল চুরি বা অদন্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত রাখে না, অধিকস্তু সৎ উপায়ে নিজের পরিশ্রমে অর্জিত বস্তু বা অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে শিক্ষা দেয়। লোভহীন জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ করে।

তৃতীয় শীলটি কামাচার বা ব্যক্তিচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এই শীলটি মানুষকে অনৈতিক আচার-আচরণ পরিহারপূর্বক নৈতিক জীবনযাপন করতে উদ্বৃদ্ধ করে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ হয়।

চতুর্থ শীলটি মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। মিথ্যাবাদীকে সকলে ঘৃণা করে, অপছন্দ করে এবং বিশ্঵াস করে না। যারা মিথ্যাকথা বলে, তারা সর্বত্র নিষিদ্ধ হয়। এই শীলটি মানুষকে কর্কশ, অপ্রিয়, অশ্রুল, কাটু, অসার কথা, পরনিষ্ঠা এবং সত্য গোপন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। ফলে কায়, বাক্য এবং মন পরিশুদ্ধ হয়।

পঞ্চম শীলটি সুরা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বিবেক, বৃদ্ধি এবং হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ এবং সম্মান নষ্ট হয়। মাদক গ্রহণকারী নানারকম পাপকর্মে লিঙ্গ থেকে মানুষের ক্ষতি সাধন করে। এমনকি দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়। মাদক গ্রহণকারীকে কেউ পছন্দ করে না। তারা ইহকালে যেমন কষ্ট পায়, তেমনি মৃত্যুর পর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। মাদকদ্রব্যের মতো ধূমপানও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই সকলের মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

পঞ্চশীলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শীল ব্যাখ্যা কর

পাঠ : ৩

শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা

শীল হচ্ছে সমস্ত কুশল ধর্মের আদি। শীল রক্ষাকর্চ। মানবজীবনে শীল অমূল্য সম্পদ। শীল পালন ব্যতীত নিজেকে কখনো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। জীবনকে সুন্দর পথে পরিচালিত করা যায় না। নৈতিক জীবনযাপন করা যায় না। শীল পালন না করলে বিচার, বিবেচনা ও বৃদ্ধি লোপ পায়। নিজের এবং অপরের মঙ্গল ও কল্যাণসাধনে শীলের মতো আর কিছুই নেই। শীল পালনের মাধ্যমে মন শান্ত হয়। মন শান্ত হলে সকল প্রকার অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়। এই শীল মানুষকে মহান ও শ্রেষ্ঠ করে তোলে। শীল পালনের মাধ্যমে পরিবারে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তেমনিভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সঙ্গাবও সুদৃঢ় হয়। এর মাধ্যমে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যা কুশল, সত্য এবং সুন্দর তা সবই শীলে রয়েছে। যাঁরা নিজের জীবনকে মহৎ করে ভুলেছেন, তাঁরা সবাই শীল পালন করেছেন। সুতরাং শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

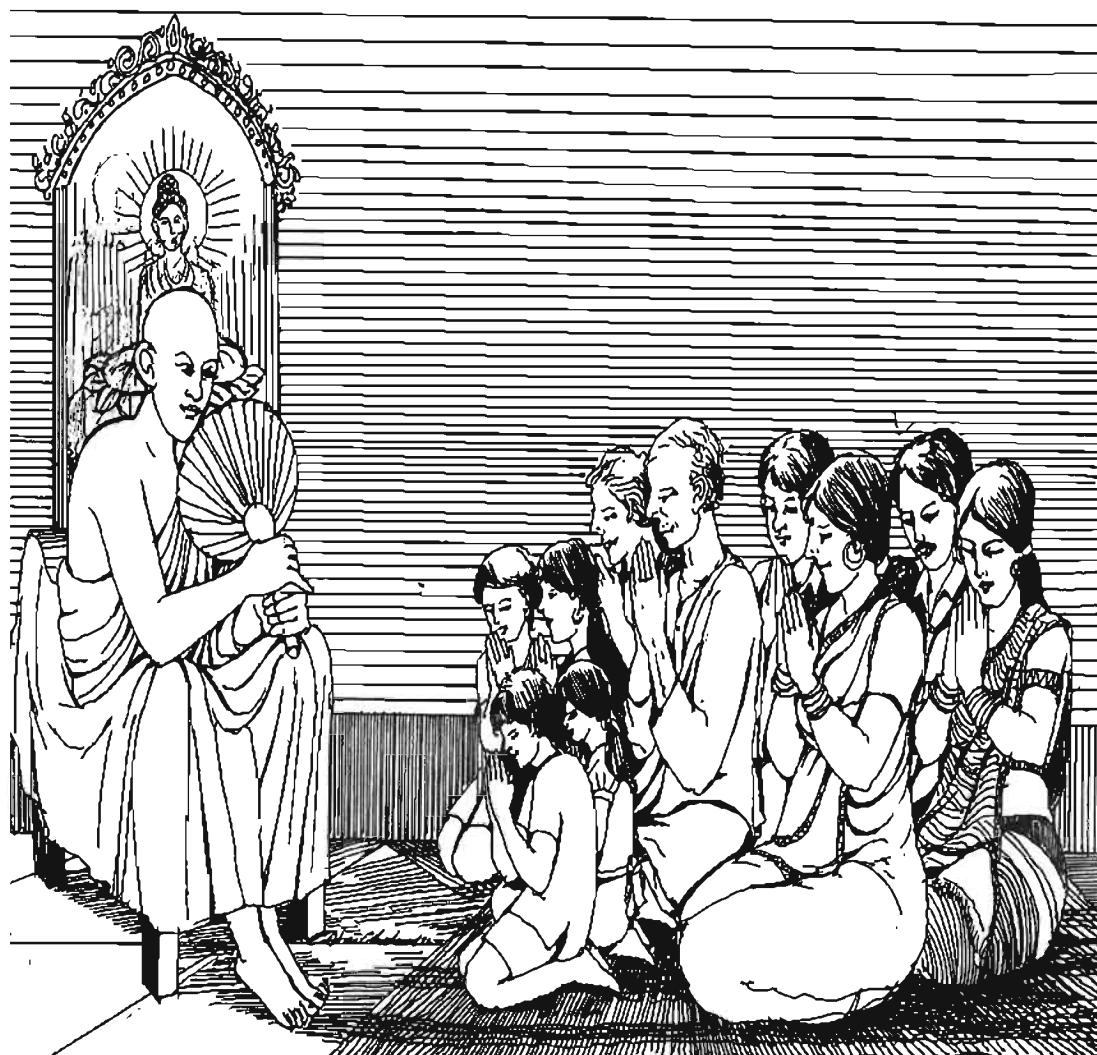
অনুশীলনমূলক কাজ

শীল মানবজীবনে কী পরিবর্তন সাধন করে?

পাঠ : ৪

পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়মাবলি

পঞ্চশীল গ্রহণ করার আগে অবশ্যই মুখ, হাত ও পা পরিষ্কার করে ধূয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়। এভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করলে মন পবিত্র হয়। শান্ত হয়। পঞ্চশীল গ্রহণ করার সময় করজোড়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসতে হয়।



ভিক্তুর নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা

পঞ্চশীল প্রার্থনা (পালি ও বাংলা)

পঞ্চশীল গ্রহণের পূর্বে ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়। পালিতে প্রার্থনা গাথাটি এরূপ :

পঞ্চশীল প্রার্থনা (পালি)

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চশীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্রহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

দুতিয়ম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চশীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্রহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

ততিয়ম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চশীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্রহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

শেখাৱ কৌশল

১. দুতিয়ম্পি বলে গাথাটি পুনৰায় বলতে হবে ।
২. ততিয়ম্পি বলে গাথাটি পুনৰায় বলতে হবে ।
৩. একজন প্রার্থনা করলে ‘অহং’ এবং বহুজনে মিলে প্রার্থনা করলে ‘অহং’ এর পরিবর্তে ‘ময়ং’ বলতে হবে । অনুরূপভাবে, একজন প্রার্থনা করলে ‘যাচামি’, বহুজনে করলে ‘যাচাম’ হবে ।
৪. পালি উচ্চারণের সময় অ-কারন্ত হলে আ-কারন্ত করে উচ্চারণ করতে হয় ।

বাংলা অনুবাদ :

ভন্তে অবকাশপূৰ্বক সম্মতি প্ৰদান কৰুন। আমি ত্ৰিশৱণসহ পঞ্চশীল ধৰ্ম প্রার্থনা কৰছি। ভন্তে দয়া কৰে আমাকে শীল প্ৰদান কৰুন।

দ্বিতীয়বাৰ ।

তৃতীয়বাৰ ।

ভিক্ষু : যমহং বদামি তৎ বদেথ (আমি যা বলছি তা বলুন) ।

শীল গ্ৰহণকাৰী : আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে বলছি)

ভিক্ষু : নমো তস্স ভগবতো অৱহতো সম্মাসমুদ্ধস্স (আমি অহং সম্যক সমুদ্ধকে বন্দনা কৰছি) ।

শীল গ্ৰহণকাৰী : নমো তস্স ভগবতো অৱহতো সম্মাসমুদ্ধস্স (তিনবাৰ বলতে হবে) ।

এৱপৰ ভিক্ষু ত্ৰিশৱণ গ্ৰহণ কৰতে বলবেন ।

ত্ৰিশৱণ

বুদ্ধং সৱণং গচ্ছামি (আমি বুদ্ধেৰ শৱণ গ্ৰহণ কৰছি) ।

ধম্মং সৱণং গচ্ছামি (আমি ধৰ্মেৰ শৱণ গ্ৰহণ কৰছি) ।

সংঘং সৱণং গচ্ছামি (আমি সংঘেৰ শৱণ গ্ৰহণ কৰছি) ।

দুতিয়ম্পি ।

ততিয়ম্পি ।

ভিক্ষু : সৱণা গমনং সম্পন্নং (শৱণে গমন বা শৱণ গ্ৰহণ সম্পন্ন হয়েছে) ।

শীল প্রার্থনাকাৰী : আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে) ।

তাৱপৰ ভিক্ষু পঞ্চশীল প্ৰদান কৰবেন এবং শীল গ্ৰহণকাৰী তা মুখে মুখে বলবেন ।

পাঠ : ৫

পঞ্চশীল (পালি ও বাংলা)

পঞ্চশীল (পালি)

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি ।

অদিঙ্গাদানা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি ।

কামেসু মিছাচারা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি ।

মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি ।

সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্টানা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি ।

বাংলা অনুবাদ :

আমি প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

আমি অদণ্ডবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

আমি ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

আমি মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

আমি সুরা এবং মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

অনুশীলনমূলক কাজ

পালিতে পঞ্চশীল প্রার্থনা করে দেখাও (দলীয় কাজ) ।

পাঠ : ৬

পঞ্চশীল পালনের সুফল

শীল পালনের সুফল অনেক । যেমন : শীল-

১) হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা বলা ও মাদক গ্রহণ থেকে বিরত রাখে ।

২) মানুষের মনের কালিমা দূর করে ।

৩) মনকে শান্ত ও সংযত করে ।

৪) চরিত্র সুন্দর করে ।

৫) কথা বলায় সংযত করে ।

৬) বিনয়ী ও ভদ্র করে ।

৭) অনৈতিক ও পাপকাজ হতে বিরত রাখে ।

৮) সৎকাজে উৎসাহিত করে ।

শীল পালনের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, ফুলের গন্ধ কেবল বাতাসের অনুকূলে যায়, প্রতিকূলে যায় না । কিন্তু শীলবান ব্যক্তির প্রশংসা বাতাসের অনুকূলে যেমন যায়, তেমনি প্রতিকূলেও যায় । হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, মাদকদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি অকুশলকর্ম ব্যক্তিজীবনকে কল্পিত করে । কল্পিত ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে নানারকম বিশ্রঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে । অপরদিকে শীলবান ব্যক্তি সকল প্রকার অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকেন । ফলে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন সুন্দর ও সুখময় হয় । তাই সকলের শীল পালন ও অনুশীলন করা উচিত ।

অনুশীলনমূলক কাজ

শীল পালনের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধ কী বলেছেন?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. শীল শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব বা |
২. যারা শীল পালন করেন তাদেরকে বলা হয় |
৩. পঞ্চশীল গ্রহণ করার সময় করজোড়ে ভেঙে বসতে হয় |
৪. এভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করলে পবিত্র হয় |
৫. পঞ্চশীল শীল |

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শীল বলতে কী বোঝা?
২. পঞ্চশীল বলতে কী বোঝা?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পঞ্চশীল প্রার্থনা বাংলা অনুবাদসহ লেখ |
২. পঞ্চশীলের প্রথম ও পঞ্চম শীল আলোচনা কর |
৩. পঞ্চশীলের সুফলসমূহ বর্ণনা কর |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিত্যপালনীয় শীল কোনটি?

- | | |
|------------|------------|
| ক. পঞ্চশীল | খ. অষ্টশীল |
| গ. দশশীল | ঘ. অর্থশীল |

২. শীল পালনের মাধ্যমে -

- i. শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করা যায়
- ii. চরিত্র সুন্দর ও পবিত্র করা যায়
- iii. আর্থিক উন্নয়ন করা যায়

- নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিনুচিং মারমা স্কুলে তার বন্ধুদের ব্যাগ থেকে প্রায়ই না বলে কখনো কলম, কখনো পেস্টিল, কখনো খাতা নিয়ে যায়। এতে তার বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা হয় না।

৩. মিনুচিং মারমা পঞ্জশীলের কোন নীতি লজ্জন করে?

- | | |
|--------------|--------------------|
| ক. মিথ্যাকথা | খ. অদ্বিতীয় গ্রহণ |
| গ. ব্যভিচার | ঘ. মাদক গ্রহণ |

৪. উক্ত আচরণের পরিবর্তনের ফলে মিনুচিং মারমা সুফল লাভ করবে -

- i. লোভহীন জীবনযাপনে উদ্বৃত্তি হবে
- ii. শান্ত ও সংযত হবে
- iii. বিনয়ী ও ভদ্র হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. প্রীতিময় চাকমা একজন সফল কৃষক। কৃষিপণ্য বিক্রি করে পরিবারের ভরণপোষণ করে থাকেন। পণ্ডিতব্য বাজারে বিক্রি করার সময় কখনো ছলচাতুরী, মিথ্যা কিংবা প্রতারণার আশ্রয় নেন না। উন্নত ও মহৎ জীবনযাপনের জন্য তিনি ধর্মীয় নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর আচরণে গ্রামবাসী মুগ্ধ।

ক. শীল কর প্রকার?

খ. নিত্যপালনীয় শীল বলতে কী বোঝায়?

গ. প্রীতিময় চাকমা যে শীল পালন করে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত শীল পালনের দ্বারা প্রীতিময় চাকমা কী ফল ভোগ করতে পারেন, পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. প্রতিমা বড়োয়া একজন পুণ্যবর্তী মহিলা। তিনি প্রতিদিন বিহারে গিয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের বন্দনা করেন। তিনি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথা বলা ও মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। এছাড়া অমাবস্যা, অষ্টমীও পূর্ণিমা তিথিতে যথাযথভাবে শীল পালন করেন।

ক. শীল শব্দের অর্থ কী?

খ. নিত্যপালনীয় শীলের প্রার্থনা পালি কিংবা বাংলায় উল্লেখ কর।

গ. প্রতিমা বড়োয়াকে কোন ধরনের উপাসিকা বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দিপকে বর্ণিত প্রতিমার আচরণ জন্ম-জন্মান্তরে সুগতি লাভ করবে—উত্তরের সপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুক্তি দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

দান

মানুষ যেসব ভালো কাজ করে তার মধ্যে ‘দান’ অন্যতম। দান বলতে সাধারণত শতহিনভাবে অন্যকে কিছু দেওয়া বোঝায়। যেমন, শীতের সময়ে যাদের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য গরম কাপড় নেই, তাদেরকে গরম কাপড় বিনামূল্যে দেওয়া। কোনো অসুস্থ মানুষকে প্রয়োজনে রক্ত দেওয়া একটি শতহিন দানের উদাহরণ। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু দেওয়ার সময় বিনিময়ে অন্য কিছু আশা করি না, এ রকম দেওয়া বা প্রদান করাকে দান বলা হয়। যিনি দান করেন বা দেন তাঁকে দাতা বলা হয়। আমরা আমাদের চারপাশে অনেককে দান করতে দেখি। দান একটি সেবামূলক কাজ। কারণ দানের উদ্দেশ্য অন্যের উপকার করা। অম, বন্ধু, বাসস্থান, গৃহধ, টাকা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে জিনিস থেকে শুরু করে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কিডনি, রক্ত, চোখ এমনকি জীবনও দান বা উৎসর্গ করা যায়। এজন্য ‘দান’ একটি মহৎ কর্ম। বৌদ্ধধর্মে ‘দান’ অন্যতম কুশলকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে দানের বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। এই অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ দান সম্পর্কে পড়ব।



শীতার্ত মানুষকে শীতবন্ধ দান

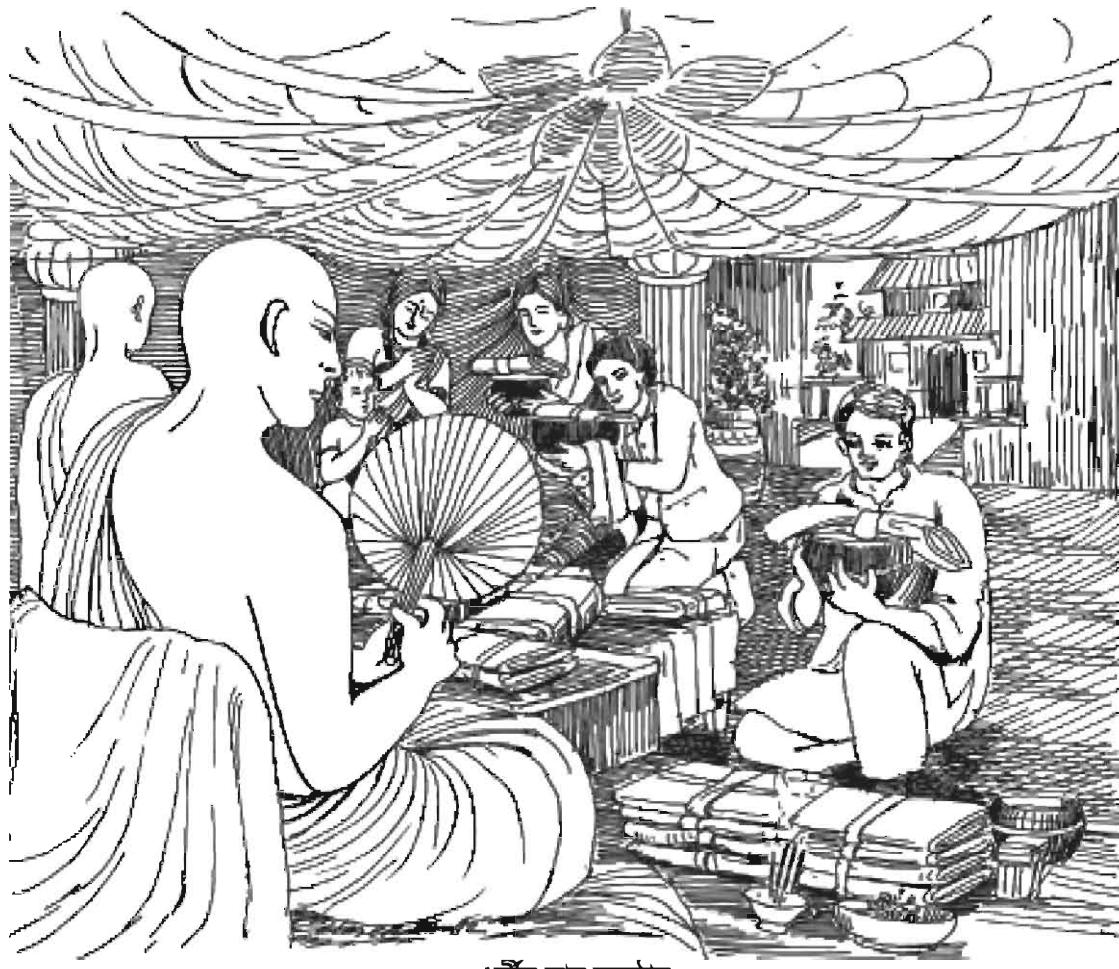
এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * বৌদ্ধধর্মে দানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- * বিভিন্ন প্রকার দানীয় বন্ধুর বিবরণ দিতে পারব।
- * দানের সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

বৌদ্ধধর্মে দান

যা দেওয়া হয় তা-ই দান। তবে 'দান' নিঃস্বার্থ ও শর্তহীন। যিনি দান করবেন তিনি নিঃস্বার্থভাবে দেবেন। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য কিংবা শীতার্ত ব্যক্তিকে বস্ত্রদান করে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা করা হয় না। এখানে দাতার কোনো স্বার্থ নেই। আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করে থাকি। এরূপ দান নিঃস্বার্থ। আমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে ঔষধ, সেবা, রক্ত, আর্থিক সহায়তা দান করি। এখানেও দাতার স্বার্থ থাকে না। বৌদ্ধধর্মে শুধু মানুষের দান নয়, পশু-পাখির দানের কাহিনীও আছে, যা বুদ্ধের জীবনী ও জাতক পঢ়ে জানা যায়। যেমন, বুদ্ধ যখন পারলেয় বনে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁকে বানর ও হাতি মধু ও ফল দান করত। দানকর্মের জন্য তারা বৌদ্ধ সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। আমরা যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই, তবে দেখি যে, গাছ আমাদের ছায়া দান করে; ফুল অকাতরে সুরভি ও সৌন্দর্য দান করে; নদী তার সুমিষ্ট জল অকৃপণভাবে



ধর্মীয় দান অনুষ্ঠান

দান করে। পরের জন্য এই অকাতর দান থেকে আমরা দানের মহত্ব উপলব্ধি করতে পারি। বৌদ্ধধর্মে ‘দান’ – এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা শুধু মানুষকে দান করেন না, পশু-পাখি এবং অদৃশ্য প্রাণীদেরও দান করেন। এ ধর্মে মৈত্রী দান করা যায়। ‘মৈত্রী’ হচ্ছে সকলের ভালো হোক এরূপ বন্দনা করা। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী দান বৌদ্ধধর্মে দানের অনন্য বৈশিষ্ট্য। দান শুধু সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। ধৰ্মী ব্যক্তি যদি অনেক কিছু দান করেন কিন্তু চিন্তের পৰিব্রতা বা মৈত্রীপূর্ণ দানের চেতনা না থাকে, সে দানও যথৰ্থ হয় না। বিশেষত বৌদ্ধদের দান দেওয়ার সময় দানীয় বস্তু, দাতা ও দান গ্রহীতার গুণগুণ সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়। দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ : ১। বস্তু সম্পত্তি ২। চিন্তা সম্পত্তি ৩। প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

বস্তু সম্পত্তি : সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি দান করা উচিত। এতে বেশি ফল লাভ করা যায়। সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা বস্তু দান করলে তাকে উত্তম দান বলা হয়। তাই সৎ উপায়ে অর্জিত দানীয় বস্তুকে বস্তু সম্পত্তি বলা হয়।

চিন্তা সম্পত্তি : দান করার সময় মৈত্রীপূর্ণ কুশল চেতনা নিয়ে দান করতে হয়। বুদ্ধ বলেছেন, চেতনা থেকে উৎপন্ন সৎ কাজই উত্তম কর্ম। লোভ, দ্রো, হিংসা, মোহ ও সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে দান করার ইচ্ছাই চিন্তা সম্পত্তি। এরূপ দানই উত্তম দান।

প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি : শীল পালন দানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দান ও শীলে প্রতিষ্ঠিত দান গ্রহীতার ওপর দানের সুফল নির্ভর করে। শীলবান দান গ্রহীতা হচ্ছেন দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। অর্থাৎ দান করার সময় দানের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত করা উচিত। নৈতিক চারিত্রিক গুণসম্পন্ন শীলবান ব্যক্তিকে দান করলে তা উত্তম দান বলে বিবেচিত হয়। শীলবান গ্রহীতাকে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি বলা হয়।

দাতার বৈশিষ্ট্য :

- ১। দান ও দানফলে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।
- ২। দানীয় বস্তু ও গ্রহীতার প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। দাতার নিজের হাতে দান করা উচিত।
- ৩। কৃপণতা ও অনুরাগ বর্জন করে উদার চিন্তে দান করা উচিত।
- ৪। সঠিক সময়ে উপযুক্ত পাত্রে দান করা উচিত।
- ৫। দানের সময় নিজেকে উত্তম ভেবে গ্রহীতাকে অধম মনে করা উচিত নয়।

দাতার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে দাতাকে তিনি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এঁরা হচ্ছে :

- ১। দানদাস
- ২। দানসহায়
- ৩। দানপতি

দানদাস : যে দাতা নিজে যা খান তার চেয়ে খারাপ খাবার দান করেন তাকে দানদাস বলা হয়।

দানসহায় : যে দাতা নিজে যেরূপ খান অপরকে সেরূপ দান করেন তাকে দানসহায় বলা হয়।

দানপতি : যে দাতা নিজে সংযম পালন করে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করেন তিনি দানপতি।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?

দান করতে হলে দাতার কী কী গুণ থাকতে হবে, উল্লেখ কর।

পাঠ : ২

দানীয় বস্তু

ছেট-বড় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৌদ্ধরা দান করে থাকেন। এসব অনুষ্ঠান একক বা ঘোষভাবে পালন করা যায়। তবে পরিকল্পিত অনুষ্ঠান ছাড়াও দান করা যায়। যা দান করা হয় তাকে বলা হয় দানীয় বস্তু। কী কী দান করা যায় এ বিষয়ে পালি গাথায় দশ রকমের বস্তুর বর্ণনা আছে।

যেমন :

অন্নং পানং বস্থুং যানং

মালাগন্ধ বিলেপনং

সেয্যা বসথ পদীপেয়ং

দানবস্থু ইসে দসা।

বাহ্লা অনুবাদ : অন্ন, জল, বস্ত্র, যানবাহন, মালা বা পুষ্প, সুগন্ধ বা সুরতি, বিলেপন বা শরীর পরিষ্কার করার জিনিস, গৃহ, শয্যাসামগ্ৰী, প্রদীপ ইত্যাদি উভয় দানীয় বস্তু। এছাড়া বুদ্ধের জীবনী, জাতক ও নীতিগাথায় দানের কাহিনী বর্ণিত আছে, যা থেকে আমরা দানীয় বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

‘বেস্মান্তর’ জাতকে উল্লেখ আছে যে, রাজা বেস্মান্তর নিজের রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব দান করে অবশ্যে নিজেকেও দান করেছিলেন। এভাবেই তিনি দান পারমী পূর্ণ করেন। শিব জাতকে শরীর ও চক্ষু দানের উল্লেখ আছে। দাসী পূর্ণা নিজের খাদ্য পোড়া রুটিখানা শ্রদ্ধাভরে এক শ্রমণকে দান করেছিলেন। ‘কুনাল’ জাতকে পঞ্চপূর্ণ চিত্তে অন্যের উপকার হয় এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুসঙ্গকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ দান করা হয়। বিপদে, দুর্যোগে বিপন্ন ও দুর্স্থ মানুষকে এমনকি অন্যান্য প্রাণীকেও প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা যায়। উষধসহ সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাও দানীয় বস্তু হতে পারে। তবে দানীয় বস্তু সত্ত্বাবে উপার্জিত হতে হবে। পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছি অর্জিত পুণ্যরাশি বৌদ্ধরা দান করেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশনা করার সময় উপাসক ও উপাসিকাদের পুণ্য দান করেন। বৌদ্ধ নর-নারীগণ অর্জিত পুণ্যরাশি জীবিত, মৃত আত্মীয়-অনাত্মীয়, বৃক্ষ, জানা-অজানা জ্ঞাতিবৰ্গ, দেবতা ও প্রেতগণ এমনকি শত্রুর উদ্দেশ্যেও দান করেন। বৌদ্ধরা সকল প্রাণির প্রতি ‘সর্বে সন্তা সুখীতা ভবত্ব’ বলে মৈত্রী দান করেন। আমরা জানি বিদ্যা অমূল্য ‘ধন, বিদ্যা দান করলে তা আরও বাড়ে। বিদ্যার মতো পুণ্যফলও দান করলে ক্ষয় হয় না, আরও বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

কী কী দান করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর (দানীয় কাজ)।

পাঠ : ৩

দান কাহিনী

এখন আমরা বৌধিসত্ত্বের একটি দান কাহিনী পড়ব। অনেক অনেক দিন আগে ভরত নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি যথাযথভাবে রাজধর্ম পালন করতেন। প্রজাদের সন্তানস্থেহে প্রতিপালন করতেন। দরিদ্র, পথিক, ভিখারি ও যাচকদের মহাদানে সন্তুষ্ট করতেন। সমুদ্র বিজয়া নামে তাঁর এক পঞ্জিত ও জ্ঞানী রানি ছিলেন। একদিন রাজা তাঁর দানশালা পরিদর্শনের সময় ভাবলেন, ‘আমি যে দান করি, তা অনেক সময় দুঃশীল ও লোভী লোকেরা তোগ করে থাকে। এতে আমার ত্রুটি হয় না। আমি শীলবান, উত্তম দানের পাত্র প্রত্যেকবুদ্ধগণকে দান করতে চাই। কিন্তু তাঁরা তো হিমবন্ত প্রদেশে থাকেন। কীভাবে তাদের নিমন্ত্রণ করিব?’ তিনি বিষয়টি রানির সঙ্গে আলোচনা করলেন। রানি বললেন, ‘মহারাজ, কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা দান, শীল ও সত্য বলে পুষ্প পাঠিয়ে প্রত্যেকবুদ্ধগণকে নিমন্ত্রণ করব এবং তাঁরা আগমন করলে অষ্টপরিষ্কার যুক্ত দান দেব।’ রাজা প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে শীল পালনের নির্দেশ দিলেন। তিনিও পরিবার পরিজনসহ শীল পালন এবং মহাদান করতে থাকলেন। সোনার পাত্রে ফুল নিয়ে তিনি প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নেমে এলেন। এরপর ভূমিতে পূর্বমুখী হয়ে পথগাঙ্গে প্রণাম করে পূর্ব দিকে যে সকল অর্হৎ আছেন সকলকে প্রণাম করলেন। পূর্বদিকে কোনো প্রত্যেকবুদ্ধ থাকলে তাঁদেরকে ভিক্ষা গ্রহণের অনুরোধ করলেন। এরপর সাতমুক্তি ফুল নিষ্কেপ করলেন। পূর্বদিকে কোনো প্রত্যেকবুদ্ধ ছিলেন না বলে পরদিন কেউ এলেন না।

এভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের প্রত্যেকবুদ্ধদের প্রতি পুষ্প নিষ্কেপ করলেন। নমস্কার করে প্রত্যেকবুদ্ধগণকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিনে উত্তর দিকে একইভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। উত্তর-হিমালয়ে বসবাসকারী প্রত্যেকবুদ্ধগণের গুহায় রাজা প্রেরিত পুষ্প পৌছে গেল। তাঁদের শরীরে সেই ফুলগুলো পতিত হলো। তাঁরা চিন্তা করে জানতে পারলেন রাজা ভরত তাঁদের নিমন্ত্রণ করছেন। তখন তাঁরা সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধকে রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেন। এই সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে রাজগৃহে এসে পৌছালেন। রাজা প্রত্যেকবুদ্ধগণকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অতি সমাদরে তাঁদের রাজগৃহে নিয়ে গেলেন। অনেক আপ্যায়ন করাগেন। অনেক দান করলেন। পরদিনের জন্য আবারও নিমন্ত্রণ করলেন। এভাবে ছয়দিন পর্যন্ত এঁদের ভোজন ও মহাদান পর্ব শেষে সপ্তম দিনে অষ্টপরিষ্কার দানের আয়োজন করলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণের মধ্যে যিনি প্রধান স্থবির, তিনি দান অনুমোদন করে একপ উপদেশ প্রদান করলেন, “দানফলই কেবল আমাদের কাজে আসে। গৃহ, অর্ধ সম্পদ, দেহ, বল সবই ক্ষয়যোগ্য।” অতঃপর ‘অপ্রমত্ত’ হতে উপদেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অবশিষ্ট ভিক্ষুরাও নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করে চলে গেলেন :

‘যিনি ধার্মিক এবং শীলবান তাঁর দানফল মরণের পরও তাঁকে অনুসরণ করে। অল্প দানেও মহাফল হয়, যদি তা শুদ্ধাযুক্ত হয়। উর্বর ভূমিতে চারা রোপণ করলে যেমন উত্তম ফসল পাওয়া যায়, সেরূপ শীলবান ও উত্তম ব্যক্তিকে দান করলে মহাফল অর্জিত হয়। দান প্রশংসনীয় কাজ। দান ও প্রজাবলে নির্বাণ লাভ সম্ভব।’

অতঃপর, রাজা ও রানি আজীবন দানব্রতে রত থেকে স্বর্গ লাভ করেন। ঐ রাজা ভরত ছিলেন বৌধিসত্ত্ব এবং রানি সমুদ্র বিজয়া ছিলেন গোপাদেবী। এই কাহিনী শেষে গৌতম বুদ্ধ বলেন, ‘জ্ঞানীরা প্রাচীনকালেও বিবেচনা করে দান করতেন।’

পাঠ : ৪

দানের সুফল

‘দান’ মানবজীবনের অন্যতম মহৎ গুণ। ছোট-বড় সকল প্রকার দানেরই সুফল আছে। দানের সুফল অনেক। ধর্মগ্রন্থে সেসব সুফলের কথা বর্ণিত আছে। বৌদ্ধরা ধর্মীয়ভাবে যে দান অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সজ্ঞাদান, অষ্টপরিক্ষার দান ও কঠিন চীবরদান উল্লেখযোগ্য। এসব দানের মাধ্যমে অনেক সুফল অর্জিত হয়। দানের মাধ্যমে দাতা অনেক পুণ্যফল অর্জন করেন। ধন ও যশ-খ্যাতি লাভ করেন। সুন্দর ও সুস্থান্ত্রের অধিকারী হন। দীর্ঘজীবী হন। সর্বত্র প্রশংসিত হন। সকলের প্রিয় হন। অভাব ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন না। সুখে জীবন যাপন করেন। চিত্ত লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। তিনি দুগ্ধিত হতে মুক্তি লাভ করেন এবং সুগতিপ্রাপ্ত হন। এছাড়া, দান পারমী পূর্ণ করার মাধ্যমে দাতা স্নোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। তাই মহাকারুণিক বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের যথাসাধ্য দান করার উপদেশ দিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মে একক দান অপেক্ষা সমবেত দানকে বেশি ফলদায়ক বলা হয়েছে। এ সমবেত দানসমূহ হলো যেমন, সজ্ঞ দান, অষ্টপরিক্ষার দান, কঠিন চীবরদান ইত্যাদি। এগুলো সম্মিলিতভাবে উদ্যাপিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের সুফলের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. ----- হচ্ছে সকলের ভালো হোক এরূপ প্রার্থনা করা।
২. অর্জিত সম্পত্তি দান করা উচিত।
৩. লোভ, ঝৰ্ণা, হিংসা, মোহশূন্য ও সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে দান করার ইচ্ছাই।
৪. জ্ঞানীরা প্রাচীনকালেও ----- করে দান করতেন।
৫. দানের মাধ্যমে দাতা অনেক ----- অর্জন করেন।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যিনি দান করবেন	দান করলে মহাফল অর্জিত হয়।
২. রাজা ও রানি আজীবন	বস্তু সম্পত্তি বলা হয়।
৩. শীলবান ও উত্তম ব্যক্তিকে	তিনি নিঃশ্বার্থভাবে দেবেন।
৪. ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে	দানব্রতে রত থেকে স্বর্গ লাভ করেন।
৫. সৎ উপায়ে অর্জিত দানীয় বস্তুকে	ভিক্ষু সজ্ঞকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ দান করা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দাতা বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. কী কী বস্তু সম্পদ দান করা যায়? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. কোন ধরনের দাতাকে দানদাস বলা হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দানপতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
২. দানের সুফলসমূহ আলোচনা কর।
৩. শীলবান ব্যক্তি উভয় দানের পাত্র – ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মে অন্যতম কুশলকর্ম কোনটি?

- | | |
|-----------|----------|
| ক. মৈত্রী | খ. শীল |
| গ. দান | ঘ. ধ্যান |

২. বৌদ্ধধর্মে দাতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- i. উপযুক্ত পাত্রে দান করা
- ii. কৃপণতা পরিহার করা
- iii. সময় বিবেচনা করা

- নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও :

অজয় মারমা একজন সৎ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাঁর ইচ্ছা হলো স্বর্গীয় মায়ের জন্য দান করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্ষু সঙ্গকে নিমত্তণ করলেন। তাই পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ দানীয় ক্ষুদ্র ক্রয়ের জন্য ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করলেন।

৩. অজয় মারমার দানটিকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে কী বলা যায়?

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ক. পুদগলিক দান | খ. সঙ্গদান |
| গ. অট্টপরিষ্কার দান | ঘ. কঠিন চীবরদান |

৪. একুশ দানের দ্বারা স্বর্গীয় মায়ের কী উপকার হবে?

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ক. সুগতি লাভ করবে | খ. মনুষ্যলোকে জন্ম নেবে |
| গ. নির্বাণ লাভ করবে | ঘ. ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবে |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. বিজলী বড়ুয়া একজন ধার্মিক উপাসিকা। তিনি প্রায়ই ভাবনা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ শেষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন গুরু ভট্টকে অফিপরিষ্কার দান করবেন। এ জন্য যথাসময়ে তিনি দানকার্য সম্পন্ন করেন।

- ক. দাতা কাদেরকে বলা হয়?
- খ. নিঃস্বার্থভাবে দান দেওয়া উচিত কেন?
- গ. বিজলী বড়ুয়ার দানীয় বস্তুর ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বিবেচনা করে দান করেছেন?
পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বিজলী বড়ুয়ার দানটি মহাফলদায়ক— উক্তরের সপক্ষে পাঠ্যবইয়ের আলোকে যুক্তি দাও।

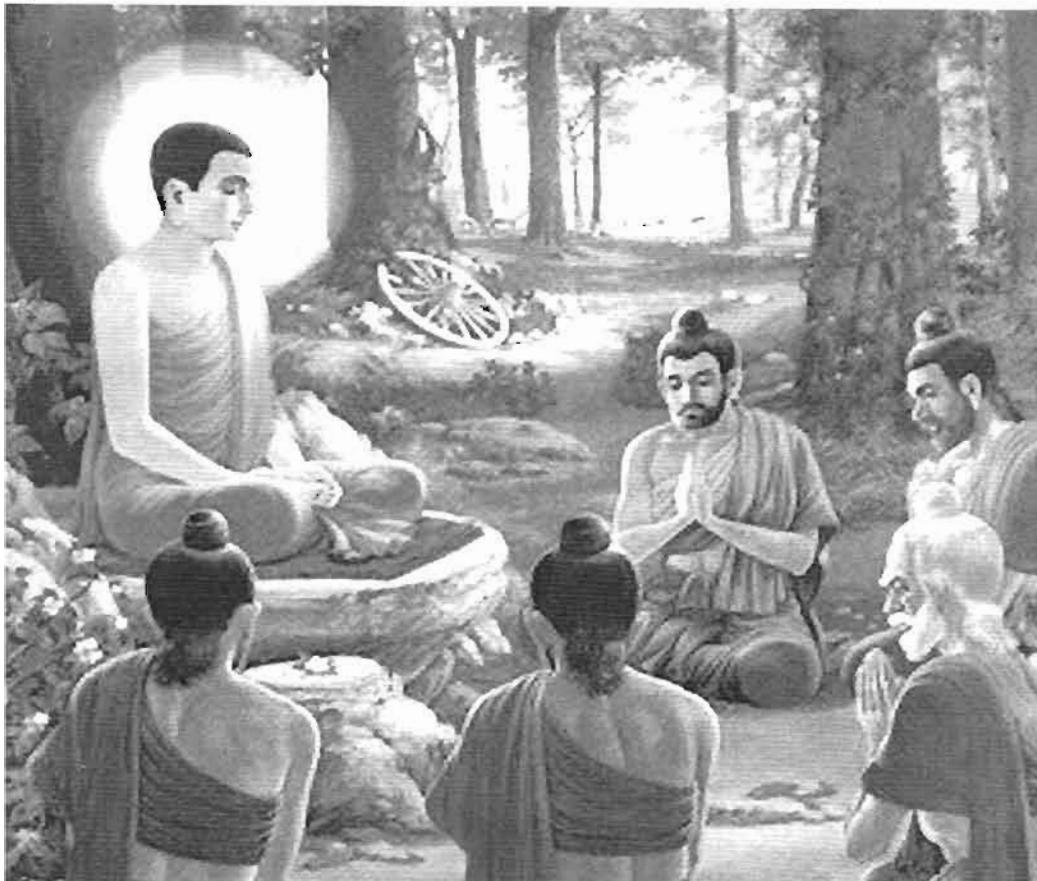
২. অমল তালুকদার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন। একদিন মার্গলাভী ভিক্ষুকে পিণ্ডান করবেন বলে মনস্থির করলেন। সংগ্রহ অর্থ থেকে একটি উৎকৃষ্ট ও দামি পণ্য ক্রয় করলেন। অমল তালুকদারের দান দেখে শ্যামল তালুকদার পরিবারের অভাব-অন্টন দূর করার জন্য এক দানীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

- ক. কোন জাতকে শরীর ও চক্ষুদানের কথা উল্লেখ আছে?
- খ. দানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
- গ. অমল তালুকদারকে কোন ধরনের দাতা বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শ্যামল তালুকদারের দানটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত তোমার উক্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

গৌতম বুদ্ধ ধর্মাপদেশ দেওয়ার সময় বিভিন্ন সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করছেন। এসব সূত্র ও নীতিগাথার মজলসকর্ম সম্পাদন এবং নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশনা আছে। ইলিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকে মূলত নীতিগাথাসমূহ সংরক্ষিত আছে। এ অধ্যায়ে খুচকপাঠ ও ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচিতি, মজলসূত্র ও দণ্ডবর্ণের পটভূমি এবং বিষয়বস্তু পড়ব।



বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে বসে শিষ্যদের সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করছেন

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * খুচকপাঠ ও ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচিতি প্রদান করতে পারব।
- * মজলসূত্র বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় বলতে পারব।
- * মজল সূত্রের পটভূমি এবং কিসে মজল হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * দণ্ডবর্ণের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারব।
- * দণ্ডবর্ণ অনুসারে দণ্ডের পরিণাম মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

খুদকপাঠ ও ধর্মপদ পরিচিতি

বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। বুদ্ধ দেশিত সূত্রসমূহ ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটককে পাওয়া যায়। খুদকপাঠ হচ্ছে সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ। ‘খুদকপাঠ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র বা সংক্ষিঙ্গ পাঠ। খুদকপাঠ গ্রন্থে মজ্জালসূত্র পাওয়া যায়। ধর্মপদ ও খুদক নিকায়ের অন্তর্গত দ্বিতীয় গ্রন্থ। ধর্মপদে বুদ্ধ ভাষিত বিভিন্ন গাথা পাওয়া যায়। ধর্মপদের অর্থ সঠিক পথ বা ধর্মের পথ। এ গ্রন্থের গাথাগুলো মানুষকে ধর্মের পথে বা সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই এ গ্রন্থের নাম ধর্মপদ। ধর্মপদে ২৬টি অধ্যায়ে ৪২৩টি গাথা আছে। এ অধ্যায়ে আমরা খুদকপাঠের ‘মজ্জালসূত্র’ এবং ধর্মপদের ‘দণ্ডবর্গ’ পড়ব।

অনুশীলনমূলক কাজ

খুদকপাঠ ও ধর্মপদের পরিচয় দাও।

পাঠ : ২

মজ্জালসূত্রের পটভূমি

মজ্জাল শব্দের অর্থ শুভ বা ভালো। আমরা নিজের ও অন্যের শুভ বা ভালো হোক কামনা করে থাকি। একে মজ্জাল কামনা বলে। অনেক সময়ই মনে প্রশ্ন জাগে, আসলে কিসে বা কী করলে মজ্জাল হয়? মানুষ নানা রকম আচরণ বা চিহ্নকে মজ্জাল ও অমজ্জাল সূচক মনে করে থাকে। যেমন: কোনো কাজে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অনেকে ডান পা আগে বাইরে দেওয়াকে মজ্জাল মনে করে। অনেকে তরা কলসসহ মেয়ে দেখলে মজ্জাল বা শুভ হয় বলে মনে করে। অনেকে কাক ডাকলে অশুভ হয় মনে করে ইত্যাদি।

গৌতম বুদ্ধের সময়েও লোকেরা কিসে মজ্জাল হয় তা নিয়ে আলোচনা করত। কেউ বলত, ভালো কিছু দেখলে মজ্জাল হয়। কেউ বলত, দেখার মধ্যে মজ্জাল নেই, শোনার মধ্যেই মজ্জাল। আবার, কেউ বলত, শোনার মধ্যে মজ্জাল নেই, মজ্জাল আছে দ্রাণ নেওয়ার মধ্যে, স্বাদ নেওয়ার মধ্যে কিংবা স্পর্শ করার মধ্যে। এভাবে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো। মানুষের পাশাপাশি দেবতাদের মধ্যেও মজ্জাল নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতো। কিন্তু এতে কোনো সমাধান হলো না। তখন তাৰতিংশ স্বর্গের দেবতারা একত্র হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের কথা শুনে একজন দেবপুত্রকে মর্ত্যলোকে ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। ভগবান বুদ্ধ তখন শ্রাবণীর জ্ঞেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। দেবপুত্রসহ অন্য দেবতারা বুদ্ধকে বসনা নিবেদন করে মজ্জাল কী জানতে চাইলেন। তার উত্তরে ভগবান বুদ্ধ দেবতা ও মানুষের উপকারের জন্য মজ্জালসূত্র দেশনা করেন। তিনি মজ্জালসূত্রে আটট্রিশ প্রকার মজ্জালের কথা বলেন। এভাবেই ‘মজ্জালসূত্রে’ উৎপত্তি হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধ কেন মজ্জালসূত্র দেশনা করেছিলেন?

পাঠ : ৩

মঞ্জলসূত্র (পালি ও বাংলা)

১. বহুদেবা মনুস্সা চ, মঙ্গলানি অচিত্যুৎ

আকর্ষণান্বৃতি মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : বহু দেবতা ও মানুষ স্বষ্টি কামনা করে কিসে মঞ্জল হয় তা চিন্তা করেছিলেন ।
কিন্তু কিসে মঞ্জল হয় তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি । আপনি দয়া করে দেবতা
ও মানুষের মঞ্জলসমূহ ব্যক্ত করুন ।

২. অসেবনা চ বালানৎ, পদ্ভিতানঞ্চ সেবনা,

পূজা চ পূজনীযানৎ, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : মূর্খ লোকের সেবা না করা, জ্ঞানী লোকের সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা
করা উত্তম মঞ্জল ।

৩. পতিরূপ দেসবাসো চ, পুরো চ কতপুঞ্জেতা,

অন্তসম্মাপণিধি চ, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : (ধর্মত পালনের উপযোগী) প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে
প্রভাবান্বিত থাকা এবং নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা উত্তম মঞ্জল ।

৪. বাহু সচঞ্চল সিঙ্গাঞ্চ, বিনযো চ সুসিক্ষিতো,

সুভাসিতা চ যা বাচা, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : বহু শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং
সুভাষিত বাক্য বলা উত্তম মঞ্জল ।

৫. মাতাপিতু উপট্র্যানৎ, পুত্রাদারস্স সঙ্গহো,

অনাকুলা চ কম্মতা, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : মাতা ও পিতার সেবা করা, স্তৰী ও পুত্রের উপকার করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসা ও
বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম মঞ্জল ।

৬. দানঞ্চ ধৰ্মচরিযা চ, ঐতাকানঞ্চ সঙ্গহো,

অনবজ্জানি কম্মানি, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : দান দেওয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণের উপকার করা এবং সন্দর্ভে অপ্রমত
থাকা উত্তম মঞ্জল ।

৭. আরতি বিরতি পাপা, মজ্জপান চ সংগ্ৰহমো,

অঞ্চলমাদো চ ধৰ্মেসু, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : কায়িক ও মানসিক পাপকাজে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপ থেকে বিরতি, মদ্যপানে বিরত থাকা এবং অপ্রমতভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উত্তম মঙ্গল ।

৮. গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুষ্টী চ কতং এন্দুতা,

কালেন ধৰ্মসৰণং, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাণ বিষয়ে সত্ত্বষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্থীকার করা ও যথাসময়ে ধৰ্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল ।

৯. খণ্ডী চ সোবচসস্তা, সমগানঞ্চ দস্সনং,

কালেন ধৰ্মসাকচ্ছা, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : ক্ষমাশীল হওয়া, গুরুজনের আদেশ পালন করা, শ্রমণদের দর্শন করা, যথাসময়ে ধৰ্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল ।

১০. তপো চ ব্ৰহ্মাচৰিযঞ্চ চ, অৱিযসচ্চান দস্সনং,

নিবানং সচ্ছিকিৰিযা চ, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : তপশ্চর্য ও ব্ৰহ্মাচৰ্য পালন করা, চারি আৰ্যসত্য হৃদয়জ্ঞাম করা এবং পৱন নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উত্তম মঙ্গল ।

১১. ফুটস্তস লোকধৰ্মেহি, চিত্তং যস্ম ন কম্পতি,

অসোকং বিৱজং খেমং, এতৎ মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : লাভ ও অলাভ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্ৰশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্ৰকাৰ লোকধৰ্মে অবিচলিত থাকা, শোক না করা, লোভ, দেৰ ও মোহেৰ মতো কলুষতা থেকে মুক্ত থাকা এবং নিৱাপদ থাকা উত্তম মঙ্গল ।

১২. এতাদিসানি কত্তান, সববথমপৰাজিতা,

সববথ সোঝিং গচ্ছতি, তৎ তেস্ম মঙ্গলমুত্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : এসব মঙ্গলকর্ম সম্পাদন কৰলে সৰ্বত্র জয় লাভ করা যায় এবং সৰ্বত্র নিৱাপদ থাকা যায় - এগুলো তাঁদেৱ (দেব-মনুষ্যেৱ) উত্তম মঙ্গল ।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

মঙ্গলসূত্ৰটি শুন্ধ উচ্চারণে সমস্বৱে আবৃত্তি কৰ (দলীয় কাজ) ।

মঙ্গলসূত্ৰে বৰ্ণিত মঙ্গলসমূহেৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰ (দলীয়ভাবে) ।

পাঠ : ৪

মঞ্জল সাধনের উপায়

মঞ্জলসুত্রে বুদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মঞ্জল সাধনের উপায় নির্দেশ করেছেন। সুত্রটি পাঠ করলে দেখা যায়, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশ সাধনে মঞ্জলসুত্রের উপদেশসমূহের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। মঞ্জলসুত্রের প্রতিটি উপদেশে মঞ্জল সাধনের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

সূত্রে বলা আছে, পশ্চিত বা জ্ঞানি ব্যক্তির সেবা করতে হবে, মুর্খ লোককে সেবা করা যাবে না। পূজনীয় ব্যক্তির সেবা করলে মঞ্জল সাধিত হয়। সন্দর্ভ আচরণ করা যায় এমন দেশে বসবাস করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে দেশে সংভাবে জীবনযাপন করা যায়, সে দেশে বসবাস করলে মঞ্জল সাধিত হয়।

নানারূপ শাস্ত্র ও বিদ্যা অর্জন করে সুশিক্ষিত হতে হবে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির বড় গুণ বিনয় ও ভদ্রতা। মঞ্জলসুত্রে বিনয়ী হতে ও সুভাষিত বাক্য বলতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরূপ নির্দেশনা মেনে চললে মঞ্জল সাধিত হয়।

মাতা-পিতা সন্তানদের অনেক কষ্ট করে লালন পালন করেন। মাতা-পিতার কারণেই আমরা পৃথিবীর আলো দেখি। বিবেকসম্পন্ন মানুষ মাতাই মাতা-পিতার সেবা করা পবিত্র কর্তব্য। স্ত্রী-পত্রের প্রতিও কর্তব্য পালন করতে হয়। এতে মঞ্জল সাধিত হয়।

সৎ ব্যবসা ও চাকরি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে মঞ্জল সাধিত হয়। দান করা, ধর্মচরণ করা, আজীব-পরিজনের উপকার করা এবং ধর্ম পালনে অবিচল থাকলে মঞ্জল সাধিত হয়।

কায়িক ও মানসিক পাপকাজ হতে বিরত থাকতে হবে। মাদক সেবন না করে অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মঞ্জল সাধিত হয়।

গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাঁদের যথাযথ সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন করা, নিজের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা এবং যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করলে মঞ্জল সাধিত হয়।

ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ, সকলকে ক্ষমাশীল হতে হবে। গুরু বা শিক্ষকের নির্দেশ প্রতিপালন করতে হবে।

শ্রমণদের দর্শন ও যথাসময়ে ধর্মালোচনা করতে হবে। এভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মঞ্জল সাধিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের পরম লক্ষ্য নির্বাণ। কুশলকর্ম সম্পাদন করে নির্বাণ পথে অগ্রসর হতে হয়। এজন্যেই মঞ্জলসুত্রে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য পালন ও চতুর্বার্য সত্য উপলক্ষ্য করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে মঞ্জল সাধিত হয়।

ইহজাগতিক লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচল থাকতে পারলে মঞ্জল সাধিত হয়। শোক, পরিতাপ, লোভ, দ্বেষ, মোহ — এ সবই ক্ষতিকর। এসব থেকে মুক্ত হতে পারলে মঞ্জল সাধিত হয়।

উল্লিখিত কুশলকর্ম জীবনে অনুশীলন করলে মানুষের মঞ্জল সাধিত হয়। মঞ্জলসুত্রের প্রতিটি নির্দেশনা মানব জীবনে অনুসরণযোগ্য। এই নির্দেশনাসমূহ প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তি ও সমাজের মঞ্জল সাধনের উপায় নির্দেশ করে।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

মঞ্জল সাধিত হয় এমন চারটি কর্মের দ্রষ্টান্ত দাও।

পাঠ : ৫

দণ্ডবর্গের পটভূমি

‘দণ্ড’ অর্থ শাস্তি। অন্যায় বা অপরাধ করলে শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য অপরাধ করার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু শাস্তি অনেক সময় অপরাধের পরিমাণ না কমিয়ে আরও অপরাধ করার ইচ্ছা জাগায়। আবার ভুল করে নিরাপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পেলে আরও অন্যায় হয় এবং মনঃকষ্ট বৃদ্ধি পায়। দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করে অন্যকে কষ্ট দিলে নিজেরও কষ্ট ভোগ করতে হয়। জীবন সকলের কাছেই প্রিয়। অনেক সময় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। মৃত্যুদণ্ড প্রদান একটি চরম সিদ্ধান্ত। যিনি দণ্ড প্রদান করেন তিনি বিচারক। তাঁকে জনী হতে হয়। জনী ব্যক্তি অনেক কিছু বিবেচনা করে শাস্তি বা দণ্ড প্রদান করে থাকেন। দণ্ড বিষয়ে ধর্মপদের দশম অধ্যায়ে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বুদ্ধের বর্ণিত এই ধর্মপোদেশ ‘দণ্ডবর্গ’ নামে অভিহিত। এ বর্গে বুদ্ধ দণ্ডের প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। তিনি শাস্তি প্রদানের সময় শাস্তিভোগকারীর কষ্ট ও মনোবেদনা উপলব্ধি করার কথা বলেছেন। শাস্তির জন্য শাস্তি প্রদান নয় বরং চিন্তশুল্ক আনয়ন করতে পারলে অন্যায় অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব। হত্যার বদলে হত্যা, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত কখনো শাস্তি আনতে পারে না। একসময় মহাকারূণিক ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থান করেন। তখন দুইজন ভিক্ষুর মধ্যে উপবেশন ও শয়ন নিয়ে বিরোধ বা মতান্বেক্য সৃষ্টি হলে তা নিরসন বা মীমাংসা করার লক্ষ্যে বুদ্ধ দণ্ড বর্গের ভাষিত গাথাগুলো দেশনা করেন। এটাই দণ্ডবর্গের মূল উৎস বা উৎপত্তির কারণ।

পাঠ : ৬

দণ্ডবর্গ (পালি ও বাংলা)

দণ্ডবন্ধ (পালি)

১. সবে তসন্তি দণ্ডস্স সবে ভায়তি মচ্ছনো,

অভানং উপমং কত্তা ন হনেয় ন ঘাতযে ।

বাংলা অনুবাদ : সবাই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সবাই সন্তুষ্ট। নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে আঘাত কিংবা হত্যা করো না।

২. সবে তসন্তি দণ্ডস্স সবেসং জীবিতং পিযং

অভানং উপমং কত্তা ন হনেয় ন ঘাতযে ।

বাংলা অনুবাদ : সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সবার প্রিয়, সুতরাং নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে প্রহার কিংবা আঘাত করো না।

৩. সুখকামানি ভুতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,

অন্তনো সুখমেসানো পেচ সো ন লভতে সুখৎ।

বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যে সুখ প্রত্যাশী প্রাণীগণকে দণ্ড দেয়, পরলোকে সে কখনো সুখ লাভ করতে পারে না।

৮. সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন হিংসতি,

অভনো সুখমেসানো পেচ্ছ সে লভতে সুখঃ ।

বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যিনি অপর সুখকামী প্রাণীগণকে দণ্ড দেন না, পরলোকে তিনি নিশ্চয়ই সুখ লাভ করবেন ।

৯. মা' বোচ ফরংসং কঞ্চি বুত্তা পটিবদ্যু তৎ,

দুক্খাহি সারস্তকথা পটিদণ্ডা ফুসেযু তৎ ।

বাংলা অনুবাদ : কাউকে কুটু কথা বলবে না । যাকে কুটু কথা বলবে, সেও তোমাকে কুটু কথা বলতে পারে । ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখকর, সেজন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকে স্পর্শ করবে ।

১০. সচে নেরেসি অভানৎ কংসো উপহতো যথা,

এস পত্তো'সি নিবৰানৎ সারস্তো তে ন বিজ্জতি ।

বাংলা অনুবাদ : আঘাত পাওয়া কাঁসার মতো যদি নিজেকে সহনশীল রাখতে পার, তবেই তুমি নির্বাণ লাভ করবে, ক্রোধ থেকে জন্ম নেওয়া বাদবিসম্বাদ আর থাকবে না ।

১১. যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং

এবং জরা চ মচু চ আয়ুং পাচেন্তি পাণিনং ।

বাংলা অনুবাদ : রাখাল যেমন দণ্ডাঘাতে গরু তাড়িয়ে গোচারণভূমিতে নিয়ে যায়, সেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ।

১২. অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্বৰ্তি,

সে হি কম্মেহি দুষ্মেধো অগ্গিদড়চো'ব তপ্পতি ।

বাংলা অনুবাদ : নির্বোধ লোক পাপকাজ করার সময় তার ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, সুতরাং দুষ্ট লোক নিজের কর্মের দ্বারা আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা ভোগ করে ।

১৩. যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু অপ্পদুট্টেসু দুস্সতি,

দসন্নমঞ্চতরং ঠানৎ খিপ্পমেব নিগচ্ছতি ।

বাংলা অনুবাদ : অদণ্ডনীয় (নির্দোষ) ও নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি দণ্ড প্রদান করে, সে ব্যক্তি সহসা দশবিধ অবস্থার মধ্যে অন্যতর (অবস্থা) লাভ করে ।

১৪. বেদনৎ ফরংসং জানিং সরীরস্স চ ভেদনৎ,

গরংকং বা'পি আবাধং চিত্তকথেপং'ব পাপুণে ।

বাংলা অনুবাদ : (তার) তীব্র বেদনা, ক্ষয়ক্ষতি, শরীরের অঙ্গচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি বা চিত্তবিক্ষেপ প্রাপ্ত হয় ।

১১. রাজতো বা উপস্সংগং অব্ভক্খানং'ব দারণং
পরিকখ্যৎ'ব এতীনং, ভোগানং'ব পভঙ্গুরং।
- বাংলা অনুবাদ : (সে) রাজরোম বা দারণ অপবাদের সমুখীন হয়, (তার) জাতিক্ষয় হয় এবং
সম্পদ নাশ হয়।
১২. অথবস্ম অগারানি অগ্রগি ডহতি পাবকো,
কায়স্ম ভেদা দুপ্পঞ্চেণ্টি নিরযং সো'প্রজ্ঞতি।
- বাংলা অনুবাদ : (তার) ঘর আগুনে পুড়ে যায়, মৃত্যুর পর সে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নরকে উৎপন্ন হয়।
১৩. ন নগ্গচরিযা ন জটা ন পক্ষা, নানাসকা থভিলসাযিকা বা,
রাজো চ জল্লৎ উক্কুটিকপ্পধানং, সোধেষ্টি মচং অবিতপ্তক্ঞথং।
- বাংলা অনুবাদ: নগ্গচর্যা, জটাধারণ, কাদালেপন, অনশন, যজ্ঞভূমিতে শয়ন, ধূলি বা ছাইমাখা, কঠিন
উৎকৃষ্ট তপস্যায় নিজেকে পীড়ন করা, এসব জপতপ কিছুতেই সংশয়ভরা মানুষকে পরিত্ব করতে
পারে না।
১৪. অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয়, সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী,
সবেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং, সো ব্রাহ্মণো সো সমগো স ভিক্খু।
- বাংলা অনুবাদ : অলংকৃত হয়েও যিনি শাস্তি, দয়িত ও সব সময় ব্রহ্মচারী, যিনি সকল প্রাণীর প্রতি
হিংসাইন হয়ে শাতিময় আচরণ করেন-তিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু।
১৫. হিরীনিসেধো পুরিসো কোচি লোকস্মিং বিজ্ঞতি,
যো নিন্দং অপ্পবোধতি অস্সো ভদ্রো কসামিৰ।
- বাংলা অনুবাদ : সুশিক্ষিত ঘোড়া যেমন কশাঘাতকে এড়িয়ে চলে, সেইরূপ লজ্জাবোধে নিন্দনীয়
কাজ এড়িয়ে চলেন এমন লোক কয়জন আছেন?
১৬. অস্সো যথাভদ্রো কসানিবিট্ঠো, আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ,
সন্ধায সীলেন চ বিরিয়েন চ, সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ;
সম্পন্নবিজ্ঞাচরণা পতিস্সতা, পহস্সথ দুক্খমিদং অনপ্পকং।
- বাংলা অনুবাদ : বেতের আঘাতে অদ্ব (সুশিক্ষিত) ঘোড়া যেমন বেগবান হয়, সেরূপ তোমরা
শক্তিমান ও বেগযুক্ত হও। শ্রদ্ধা, শীল, পৌর্য, সমাধি ও ধর্মজ্ঞান দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পন্ন
ও সৃতিমান হয়ে অপরিমেয় দুঃখরাশি হতে মুক্ত হও।

১৭. উদকৎ হি নয়ন্তি নেতৃত্বিক, উসুকারা নমযন্তি তেজনৎ,

দারণৎ নমযন্তি তচ্ছকা, অভানৎ দমযন্তি সুব্রতা ।

বাংলা অনুবাদ : জল সেচনকারী যেমন জলকে ইচ্ছামতো চালিত করেন, শর-নির্মাতা যেমন শরকে সোজা করেন, কাঠঘির্সি (তক্ষক) যেমন কাঠের টুকরাকে ইচ্ছামতো আকার দান করেন, ব্রতচারী ব্যক্তিও তেমনি নিজেকে দমন করেন ।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিতর্ক অনুষ্ঠান

বিষয় : হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয় ।

পাঠ : ৭

দণ্ডের পরিণাম

জীবন সকলেরই প্রিয় । জগতের সকল প্রাণী মৃত্যু ও দণ্ডকে ভয় পায় । তাই অপরকে নিজের মতো ভেবে কাউকে আঘাত করা উচিত নয় । নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য দুর্ভিতি-পরায়ণ ব্যক্তি অপরকে দণ্ড দ্বারা আঘাত ও হত্যা করে । কিন্তু দণ্ড প্রয়োগে প্রকৃত সুখ অর্জন করা যায় না । দণ্ডের পরিণাম ভয়াবহ । এতে প্রতিশেধ স্পৃহা জাগ্রত হয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায় । নিরাপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রয়োগ গুরুতর অপরাধ এবং পাপও বটে । যে দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি নিরাপরাধ ব্যক্তি, কল্যাণ মিত্র বা সাধু ব্যক্তিকে দণ্ড প্রয়োগ করে বা মিথ্যা নিন্দা আরোপ করে, পরিণামস্বরূপ সে দশবিধি দুঃখজনক অবস্থার অন্যতম অবস্থাপ্রাপ্ত হয় । যথা : ১) সে শিরঃপীড়া, শূলরোগ প্রভৃতি দ্বারা তীব্র যত্নগ্রস্ত ভোগ করে; ২) তার স্বীয় শ্রমলক্ষ সম্পত্তির অপচয় হয়; ৩) তার শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়; ৪) তার শরীরের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, চক্ষুহানি, মেরুদণ্ড বিকৃতি, কুঠ প্রভৃতি গুরুতর রোগ উৎপন্ন হয়; ৫) সে উন্নাদ, রোগগ্রস্ত হয়; ৬) তাকে রাজাপরাধী সাব্যস্ত করে রাজকর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হয়; ৭) সে অনাকাঙ্খিত বিষয়ে জড়িত হয়ে নিদারণ কলক্ষের ভাগী হয়; ৮) তার আশ্রয়দাতা জ্ঞাতিগণের বিয়োগ হয়; ৯) তার সন্ধিত ধন-সম্পদ নষ্ট হয় এবং ১০) তার গৃহ আগনে পুড়ে ধৰ্মস হয় ।

এই ভয়াবহ পরিণাম হতে রক্ষা পেতে হলে দণ্ড ত্যাগ করে মৈত্রীভাব পোষণ করা উচিত । বৃদ্ধ বলেছেন, শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা প্রশংসিত হয় না । মৈত্রী বা ভালোবাসা দ্বারা শত্রুতা প্রশংসিত হয় । যিনি নিজের সুখের জন্য অপর সুখকাতর জীবের প্রতি হিংসা করেন না, দণ্ড প্রয়োগ করেন না, তিনি মৃত্যুর পর পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে পরিশেষে পরম নির্বাণসুখ লাভ করেন । তাই সকলের দণ্ড ত্যাগ করা উচিত ।

অনুশীলনমূলক কাজ

দণ্ডের পরিণাম বর্ণনা কর ।

পাঠ : ৮

মঞ্জলসূত্র ও দণ্ডবর্গের শিক্ষা

মঞ্জলসূত্র ও দণ্ডবর্গে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। মঞ্জলসূত্রে মানুষকে জ্ঞানী লোকের সেবা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানী লোককে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর নির্দেশনা মানতে হবে। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের উপযোগী দেশে বসবাস করতে বলা হয়েছে। ভালো কাজের কথা অরণ করে নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নানা বিষয়ে বিদ্যা অর্জন, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সব সময় সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে, যাতে কেউ কষ্ট না পায়। মাতা-পিতা গুরুজনের সেবা করতে হবে। স্ত্রী-পুত্রের উপকার করতে হবে। সৎ ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। দান-কর্ম ও আত্মীয়-স্বজনের উপকার করতে হবে। সদ্র্ধমে অবিচল থাকতে হবে। শারীরিক বা মানসিক পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে। কীর্তিমান সফল ব্যক্তিদের সাফল্যকে স্মীকৃতি দিতে হবে। তাঁদের প্রতি সম্মান জানতে হবে। অঙ্গে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকার করতে হবে। যথাসময়ে ধর্মকথা শুনতে হবে। ক্ষমাপ্রায়ণ হতে হবে। ধৈর্য ও প্রতিপদ বাক্য চর্চা করতে হবে। ভিক্ষু-শ্রমণ দর্শন ও ধর্ম আলোচনা করতে হবে। ধ্যান, সমাধি ও চারি আর্যসত্য অনুধাবন করতে হবে। নির্বাণ পথে পরিচালিত হতে হবে। লাভ-ক্ষতি, খ্যাতি-অখ্যাতি, নিষ্ঠা বা প্রশংসা, সুখ-দুঃখ সর্বক্ষেত্রেই চিন্তকে স্থির রাখা, শোক না করা, লোভ, হিংসা, মোহ প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকার অনুশীলন করে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করতে হবে। ধীরা এ সকল মেনে জীবনযাপন করে, তাঁরা সব সময় সর্বক্ষেত্রে জয়লাভ করতে পারে। মঞ্জলসূত্রে বুদ্ধ এ সমস্ত কাজকে উন্নত বা প্রেষ্ঠ মঞ্জল বলেছেন। মঞ্জলসূত্রে উপরে বর্ণিত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারি।

দণ্ডবর্গ পাঠেও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করা যায়। দণ্ডবর্গ হতে আমরা শিক্ষা পাই যে দণ্ড প্রয়োগ বা শাস্তি দ্বারা অন্যায় প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। অন্যায়কারীকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারলেই অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব। কারো প্রতি প্রতিহিংসাপ্রায়ণ হয়ে শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। শাস্তি প্রদানের সময় শাস্তির পরিমাণ বিবেচনা করতে হয়। অপরকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখী হওয়া যায় না। প্রচলিত আইনে অপরাধীর জন্য যে শাস্তির বিধান আছে তা প্রয়োগে কর্তৃপক্ষকে খুবই সতর্ক হতে হবে। কারণ বলা আছে, ভুল বিচারে একাধিক দোষী ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যাক, কিন্তু একজনও নিরাপরাধ ব্যক্তি যেন বিনা দোষে শাস্তি না পায়। দণ্ডবর্গে প্রতিহিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কারো প্রতি কটুকথা, ক্রোধপূর্ণ বাক্য বা প্রতিদণ্ড প্রদান করা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

নিরাপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দিলে ইহজগতে এবং পরজন্মে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। মৈত্রী অনুশীলনের মাধ্যমে শত্রুকেও বন্ধু করা সম্ভব। কারণ প্রতি ক্ষুধ্য হয়ে প্রতিহিংসাবশত দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। আত্মসংযম, সহনশীলতা, মৈত্রী ও ক্ষমা অনুশীলন করা উচিত।

দণ্ডবর্গ অন্যের জীবনকে নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে শাস্তি প্রদানের পরিগাম অনুধাবন করতে শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

মঞ্জলসূত্র ও দণ্ডবর্গের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পৃথক তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. দণ্ড বিষয়ে ধর্মপদের..... চর্চার বর্ণনা পাওয়া যায়।
২. বুদ্ধ বর্ণিত মঞ্জলসমূহ অনুসরণ করলে সবখানে..... করা যায়।
৩. শান্তি প্রদানের সময় শান্তির..... বিবেচনা করতে হয়।
৪. মা-বাবা ও গুরুজনে..... করতে হয়।
৫. মৈত্রী বা ভালোবাসা দারা..... বর্ণ্ণ করা সম্ভব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ট্রিপিটকের কোথায় নীতিগাথাসমূহ সংরক্ষিত আছে?
২. ‘ধর্মপদ’ নামকরণ কেন হলো?
৩. ধর্মপদের কোন অধ্যায়ে ‘দণ্ডবর্গ’ পাওয়া যায়?
৪. মাতাপিতৃ উপট্ঠান, পুত্রাদারস্স সঙ্গাহো, অনাকুলা চ কম্ভাতা, এতৎ মঞ্জলমুত্তমৎ— বাঙ্গায় বঞ্জানুবাদ কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বুদ্ধ কেন মঞ্জলসূত্র দেশনা করেছিলেন?
২. কাদের সেবা করলে উভয় মঞ্জল হয়?
৩. “নিরাপরাধ ব্যক্তির শান্তি পাওয়া উচিত নয়” ব্যাখ্যা কর।
৪. মঞ্জলসূত্র হতে কী শিক্ষা লাভ করা যায় তা বর্ণনা কর।
৫. দণ্ডের পরিগাম বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘মঞ্জলসূত্রে’ কয় প্রকার মঞ্জলের কথা বলা হয়েছে?

ক. ২৬	খ. ৩০
গ. ৩২	ঘ. ৩৮
২. ‘মাতাপিতৃ উপট্ঠান’ বলতে বোঝায় -

ক. মা-বাবাকে সম্মান করা	খ. মাতা-পিতার সেবা করা
গ. মা-বাবার গৌরব করা	ঘ. জ্ঞানী লোকের সেবা করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

অরিন্দম সিংহ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। স্কুলে গিয়ে সে জানতে পারে তার ধর্মীয় শিক্ষক কয়েক দিন যাবৎ অসুস্থ। সে শিক্ষকের সেবা করতে তাঁর বাড়ি গেল।

৩. অরিন্দম সিংহের আচরণে মঙ্গলসূত্রের যে উপদেশটি প্রতিফলিত হচ্ছে, তা হলো-

- i. জ্ঞানী লোকের সেবা করা
- ii. পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা
- iii. শ্রমণদের দর্শন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

৪. অরিন্দমের কাজকে কোন ধরনের কাজ বলা যায়?

- | | | | |
|----|---------|----|---------------|
| ক. | মঙ্গলের | খ. | উত্তম মঙ্গলের |
| গ. | গৌরবের | ঘ. | সম্মানের |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ঘটনা-১

গৃহ জাতকে বোধিসত্ত্ব গৃহ বা শকুন হয়ে জন্মেছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখাশোনা করতেন। তাঁরা এক পর্বতের ওপর শকুনদের নির্জন গুহায় থাকতেন। বোধিসত্ত্ব বারানসির শুশান থেকে মৃত গরুর মাংস এনে মা-বাবাকে খাওয়াতেন।

ঘটনা-২

মিলির মা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দেখলেন, পাশের বাড়ির খুকি খালি কলস নিয়ে তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে। এতে মিলির মা তাকে গালমন্দ করে।

- ক. বুদ্ধের দেশিত সূত্রসমূহ কোথায় সংরক্ষিত আছে?
- খ. বিচারককে জ্ঞানী হতে হয় কেন?
- গ. ঘটনা-১ -এর সাথে মঙ্গলসূত্রের কোন শ্লোকের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মিলির মায়ের আচরণটি মঙ্গলসূত্রের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২.

অনুচ্ছেদ-১

রাজু মুঠসুন্দির চাকরি ক্ষেত্রে অনেক সুনাম রয়েছে। কিন্তু তাঁর অনেক সহকর্মী অফিসের দায়িত্ব পালনের সময় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে বিভিন্ন অকুশল কর্ম করত। একদিন উৎবর্তন কর্তৃপক্ষ অফিসে অডিট করতে এসে বিভিন্ন অপকর্মের সম্বান্ধ পান। সহকর্মীরা উক্ত অপকর্মের জন্য উল্টো রাজুকেই দোষারোপ করেন। ফলে তাঁকে বিভাগীয় শাস্তি ভোগ করতে হয়।

অনুচ্ছেদ-২

হে প্রিয় তুমি যদি কারো প্রতি ক্ষুব্ধ হও,

কেউ যদি তোমাকে রুষ্ট করে,

মৈত্রী ও শাস্তির বাণী উচ্চারণ কর।

সহসা তোমার রাগ থেমে যাবে।

ক. ‘খুদ্দকপাঠ’ শব্দের অর্থ কী?

খ. দেবতারা বুদ্ধের কাছে কেন গিয়েছিলেন?

গ. অনুচ্ছেদ-১ -এর সাথে দণ্ডবর্গের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদ-২ -এর সাথে দণ্ডবর্গের সাদৃশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চতুরার্থ সত্য

একদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধার্থ জগতের দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন। তারপর ছয় বছর তপস্যার ফলে লাভ করেন বুদ্ধত্ব। আবিষ্কার করেন দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য। একে বৌদ্ধ পরিভাষায় চতুরার্থ সত্য বলা হয়। চতুরার্থ সত্য বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব। বুদ্ধ পঞ্চবর্ণীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম চতুরার্থ সত্য দেশনা করেন। চতুরার্থ সত্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করে। এ সত্যকে ভালোভাবে বুবাতে পারলে পরম শান্তি নির্বাণ লাভ সম্ভব। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি চতুরার্থ সত্য সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * চতুরার্থ সত্যের ধারণা দিতে পারব।
- * দুঃখসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- * দুঃখের কারণ ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- * চতুরার্থ সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

চতুরার্থ সত্য পরিচিতি

চতুরার্থ সত্য বুদ্ধের অনন্য উপলব্ধি। মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়। জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়ে নানা অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। তরুণ বয়সে সিদ্ধার্থ নগর দর্শনে বের হলে ব্যাধি এবং জরাগ্রস্ত মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে দেখেন। একদল লোককে শোক করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখেন। জীবনের এক্সপ পরিণতি দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন জগৎ দুঃখময়। তারপর, সিদ্ধার্থ সংসারত্যাগী একজন সন্ন্যাসীকে দেখেন। সাথে থাকা সারথী ছন্দককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ঈ শান্ত-সৌম্য ব্যক্তিটি কে?’ ছন্দক বললেন, ইনি শান্তি অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করেছেন। সিদ্ধার্থও দুঃখমুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য গৃহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে মানুষের দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণে তিনি ছয় বছর কঠোর তপস্যা করে দুঃখমুক্তির উপায় চতুরার্থ সত্য আবিষ্কার করেন। চতুরার্থ সত্য হচ্ছে :

- ১। দুঃখ আর্যসত্য
- ২। দুঃখের কারণ আর্যসত্য
- ৩। দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য
- ৪। দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

অনুশীলনমূলক কাজ
চতুরার্থ সত্য কী কী?

পাঠ : ২

চতুরার্থ সত্যের ব্যাখ্যা

দুঃখ আর্যসত্য

জগৎ দুঃখময়। সুখ এখানে ক্ষণস্থায়ী। যা কিছু আমরা সুখ বলে জানি, তা সবই ক্ষণস্থায়ী। সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। এই ছুটে চলার মাঝে দুঃখই পাই বেশি। সুখ যেন পরশ পাথর, বুরো ওঠার আগেই হারিয়ে যায়। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ বুবাতে পারে না সুখের আড়ালেই দুঃখ রয়েছে। জ্ঞানের অভাবে আমরা দুঃখকে চিনতে পারি না। অঙ্গতাই দুঃখকে চিনতে না পারার কারণ। সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে মানুষ দুঃখ ভোগ করে। দুঃখ অনেক প্রকার। বুদ্ধ সেগুলোকে প্রধানত আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :

- ১) জন্ম দুঃখ
- ২) জরা দুঃখ
- ৩) ব্যাধি দুঃখ
- ৪) মৃত্যু দুঃখ
- ৫) অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ
- ৬) প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ
- ৭) ইল্লিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং
- ৮) পঞ্চক্ষন্ধময় এ দেহ ও মন দুঃখময়।

এ দুঃখগুলো চরম সত্য। দুঃখ সর্বজনীন। সকলকে কোনো না কোনোভাবে দুঃখ ভোগ করতে হয়। দুঃখ হতে কারো নিষ্ঠার নেই। তাই বুদ্ধ এগুলোকে দুঃখ আর্যসত্য বলে অভিহিত করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন নানা দুঃখে পূর্ণ। জীবিত মানুষ মাত্রেই নানারকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বয়স বাড়ে, দাঁত পড়ে, দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়। একে বলে জরাগ্রস্ত হওয়া। বার্ধক্য আঘাত হানে। চুল পাকে। এমনি করে একদিন মৃত্যু আসে। একজনের মৃত্যু হলে প্রিয়জন শোক করে। এভাবে দুঃখের সমুদ্রে মানুষের জীবন ভাসমান।

অনুশীলনমূলক কাজ
দুঃখ আর্যসত্যে বর্ণিত দুঃখসমূহ উল্লেখ কর (দলীয় কাজ)।

দুঃখের কারণ আর্যসত্য

কারণ ছাড়া কোনো কার্যের উৎপত্তি হয় না। সবকিছুরই কারণ আছে। দুঃখ উৎপত্তিরও কারণ আছে। দুঃখ আছে জেনেও মানুষ মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে আরও দুঃখ ভোগ করে। জন্ম নিলেই দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাহলে কী কারণে মানুষ জন্মগ্রহণ করে? জন্মের কারণ ত্বক। আর ত্বকার কারণ অঙ্গতা বা জ্ঞানের অভাব। অঙ্গতার কারণে আমরা অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য মনে করি। ফলে পৃথিবীর রূপ, রস, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হই এবং তা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আগুনের কাছে যায় এবং আহত বা হতও হয়, তেমনি মানুষও মোহাচ্ছন্ন হয়ে বারবার দুঃখ ভোগ করে। জগতের ক্ষণস্থায়ী বস্তু পাওয়ার জন্য তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়। এই আকাঙ্ক্ষার ফলেই আমরা বারবার জন্মগ্রহণ করি। কামনা, বাসনা, লোভ, অহংকার, মোহ, শোক- এসবই ত্বক থেকে উৎপন্ন হয়। ত্বকাই দুঃখের কারণ।

অনুশীলনমূলক কাজ
দুঃখের কারণ কী?

দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য

আমরা জেনেছি ত্রুটাই দুঃখের কারণ। ত্রুটার ফলেই আমরা বারবার জনগ্রহণ করি। জনগ্রহণ করে অসংখ্য দুঃখ ভোগ করি। সুতরাং ত্রুটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দুঃখ নিরোধ সম্ভব। ত্রুটার ক্ষয় পুনর্জন্ম রোধ করে। ত্রুটার বিনাশ করাই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য।

দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য

রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঔষধ থেতে হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে হয়। সব সমস্যার সমাধান আছে। তথাগত বুদ্ধ কঠোর তপস্যা করে দুঃখ নিরোধের উপায়ও আবিষ্কার করেছেন, যা দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য নামে পরিচিত। বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের উপায়। মার্গ অর্থ পথ। আটটি সত্য পথ অনুসরণ করে আমরা দুঃখ নিরোধ করতে পারি। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিম্নরূপ :

১. সম্যক দৃষ্টি
২. সম্যক সংকল্প
৩. সম্যক বাক্য
৪. সম্যক কর্ম
৫. সম্যক জীবিকা
৬. সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা
৭. সম্যক স্মৃতি
৮. সম্যক সমাধি।

অনুশীলনমূলক কাজ

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী?

পাঠ : ৩

চতুরার্থ সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব

চতুরার্থ সত্য বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি। এই সত্যসমূহ বুঝতে না পারলে বৌদ্ধধর্মকে কখনো বোঝা যাবে না। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য দুঃখ হতে মুক্তি এবং পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করা। দুঃখসমূহ কী কী, কী কারণে দুঃখ উৎপন্ন হয়, দুঃখের নিরোধ আছে কি না এবং দুঃখ নিরোধের উপায় প্রভৃতি সঠিকভাবে না জানলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তাই চতুরার্থ সত্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার। চতুরার্থ সত্যের মাধ্যমে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। চতুরার্থ সত্য মতে, ত্রুটাই মানুষের দুঃখের কারণ। অজ্ঞতার কারণে ত্রুটা উৎপন্ন হয়। ত্রুটা হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। চতুরার্থ সত্য আমাদেরকে লোভ, হিংসা, মোহ ও অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকার এবং দুঃখ হতে মুক্তির উপায় শিক্ষা দেয়। ফলে চতুরার্থ সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা সহজে বোঝা যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কেন চতুরার্থ সত্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. সিদ্ধার্থ জগতের উপায় অস্বেষণে গৃহত্যাগ করেন।
২. বৌদ্ধ ধর্মের মূলতত্ত্ব।
৩. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনই পূর্ণ।
৪. দুঃখকে চিনতে না পারার কারণ।
৫. বুদ্ধ নির্দেশিত দুঃখ নিরোধের উপায়।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সুখের আকাঙ্ক্ষা	দুঃখ ভোগ করতে হয়।
২. অভ্যন্তর কারণে আমরা অসত্যকে সত্য	আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়।
৩. সকলকে কোনো না কোনোভাবে	দুঃখ নিরোধের উপায়।
৪. ত্রুট্য হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার	সত্যকে অসত্য মনে করি।
৫. বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই	তৈরি আকাঙ্ক্ষা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের নামগুলো লেখ।
২. বুদ্ধ দুঃখকে কয় ভাগে বিভক্ত করেন? সেগুলো কী কী।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. চতুরার্থ সত্য বর্ণনা কর।
২. দুঃখের কারণ আর্যসত্য ব্যাখ্যা কর।
৩. দুঃখ নিবারণের উপায় আর্যসত্য বর্ণনা কর।
৪. 'চতুরার্থ সত্যই বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি' ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কয় প্রকার?

ক. ৪

খ. ৮

গ. ১০

ঘ. ১২

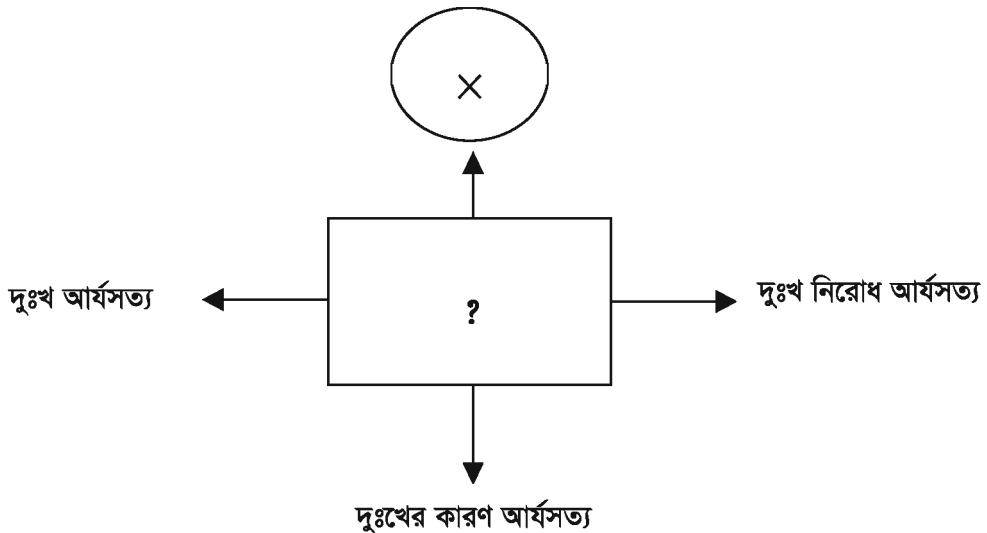
২. চতুরার্থ সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব-

- i. দুঃখ হতে মুক্তি
- ii. নির্বাণ লাভ করা
- iii. মার্গফল লাভ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের ছকটি দেখে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. ‘?’ চিহ্নের মাধ্যমে ছকে কী নির্দেশ করছে?

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ক. ত্রিপিটক | খ. চতুরার্থ সত্য |
| গ. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ | ঘ. ত্রুটার ক্ষয় |

৪. ছকে ‘X’ চিহ্নিত স্থানের সত্যটি হলো-

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ক. দুঃখ নিরোধের উপায় | খ. হিংসার বিনাশ করা |
| গ. বারবার জন্মগ্রহণ করা | ঘ. কামনা-বাসনা পূরণ করা |

সংজনশীল প্রশ্ন

১. সুষমা একজন রাখাইন মেয়ে। তিনি ও তাঁর বন্ধু একদিন কিয়াৎ (বিহার) -এ প্রার্থনা করতে গিয়ে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পম্বাসনে বসে চোখ বন্ধ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তখন আরেকজন ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাঙ্গে, উনি কী করছেন? ভিক্ষু বললেন তিনি ধ্যান-সাধনায় মগ্ন আছেন।

ক. চতুরায় সত্য কী?

খ. দুঃখের কারণ বলতে কী বোঝায়?

গ. বৌদ্ধ ভিক্ষুটি কোন পথ অনুসরণ করছেন? বর্ণনা দাও।

ঘ. উক্ত পথ অনুসরণের ফলে ভিক্ষুটি কোন সত্য উপলব্ধি করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা দাও।

ঘটনা-১

লাভলী ও সৈকত দম্পত্তির এক সন্তান। তাঁদের স্বপ্ন সন্তানকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করা। কিন্তু সঙ্গাদোষে তাঁদের সন্তান উচ্ছুঙ্গল হয়ে যায়।

ঘটনা-২

ছেটবেলা থেকে সীমান্ত বড়ুয়া দেখছে তার মা প্রায়ই শারীরিক অসুস্থ থাকেন। রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেলে তিনি নিজ সন্তানদের সহ্য করতে পারেন না। একদিন ঐ রোগের কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। মাঝের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে দুঃখ থেকে মুক্তির আশায় সীমান্ত প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হলেন।

ক. সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছেন কেন?

খ. দুঃখ আর্যসত্য কী?

গ. ঘটনা-১ -এ দুঃখ আর্যসত্যের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ -এ সীমান্তের অনুসৃত পথ থেকে কোন সত্য উপলব্ধি করতে পারবে বলে মনে কর? ব্যাখ্যা কর।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব

বৌদ্ধরা নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। যেমন বুদ্ধ-পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, কঠিন চীবরদান ইত্যাদি। বৌদ্ধ বিহার এবং পারিবারিক অঙ্গনে এসব আচার-অনুষ্ঠান উদ্যাপন করা হয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানমতে আচরণীয় ও পালনীয় অনুষ্ঠানসমূহকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলে। কিছু কিছু বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ধর্মীয় ভাবধারায় ঝাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্যাপন করা হয়। সেই আচার-অনুষ্ঠানগুলো ধর্মীয় উৎসব নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় বছরের বিভিন্ন সময়ে একুপ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। এ অধ্যায়ে বৌদ্ধদের কয়েকটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* বৌদ্ধ ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে পারব।

* বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পরিচিতি

বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহ ধর্মীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে সংজ্ঞাতি রেখেই অনুষ্ঠিত হয়। যে অনুষ্ঠানগুলো চান্দুবছরের নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলো ধর্মীয় তিথি বা পর্ব। যেমন— বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদি। এছাড়া যে অনুষ্ঠানগুলো বছরের যে কোনো সময় করা যায় সেগুলোকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়। যেমন— সজ্জদান, অষ্টপরিষ্কারদান, প্রবজ্যা, উপসম্পদা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। আবার ‘কঠিন চীবরদান’ অনুষ্ঠান করতে হয় বছরের নির্দিষ্ট মাসে। এটিও একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানগুলো পালনের ব্যাপকতায় উৎসবে পরিগত হয়। বর্তমানকালে প্রায় সব অনুষ্ঠানই উৎসবের আকার ধারণ করে।

বৌদ্ধদের বেশির ভাগ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। তবে অমাবস্যায় কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনে বাধা নেই। বৌদ্ধধর্ম মতে প্রত্যেক দিনই শুভ। অশুভ বলে কোনো দিন নেই। নিজের কর্মের মধ্যেই শুভ-অশুভ নির্ভর করে। এমন কোনো সময় নেই, যে সময় ভালো কাজ করলে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা অত্যন্ত ভালো কাজ। যে কোনো দিন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা যায়। তবে কিছু আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিনেই সম্পাদন করতে হয়। পবিত্র মন নিয়ে এসব দিনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা সকলের উচিত। এতে মন প্রসন্ন হয়। চিন্ত শুন্দর হয়। সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। নৈতিকতা জগতে হয় এবং জীবন সুখের হয়।

বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো প্রধানত পূর্ণিমাকেন্দ্রিক। প্রত্যেক পূর্ণিমার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোনো না কোনো অরণ্যীয় ঘটনা জড়িত রয়েছে। বুদ্ধের জীবনাদর্শ অরণ্য ও অনুশীলনের জন্য বিবিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। মূলত, এসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের মাধ্যমে ঐতিহাসিক অরণ্যীয় ঘটনাগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যুগ যুগ ধরে এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো বৌদ্ধরা পালন করে আসছে। প্রত্যেক পূর্ণিমায় বৌদ্ধ নরনারী সকলে বিহারে সমবেত হয়। সম্মিলিতভাবে বুদ্ধপূজা ও উপাসনা করে। পঞ্চশীল ও উপোসথশীল গ্রহণ করে। দুপুরে ধ্যান সমাধি চর্চা করে। বিকালে তিঙ্গুদের কাছ থেকে ধর্মকথা বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা-৬ষ্ঠ, ফর্মা নং-৮

শোনে। সম্বৰ্ধায় প্রদীপ পূজা ও পানীয় পূজা করে। অনেক বৌদ্ধ বিহারে বিকালে ধর্মসভা ও সম্বৰ্ধায় বুদ্ধকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। রাতে নির্মল আনন্দচিত্তে সকলে বাড়ি ফিরে যায়।

এই ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধরা একত্র হয়। তাই এসব অনুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। এ অনুষ্ঠানগুলো একরকম সামাজিক মিলনমেলা। এগুলো ধর্মীয় ভাবগান্তীর্থে পালন করতে হয়। এ অনুষ্ঠানসমূহে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করা হয়।

বৌদ্ধদের কিছু অনুষ্ঠান আছে পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেগুলোকে পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বলা যায়। যেমন-শ্রমণের প্রব্রজ্যা, মৃতদেহ সৎকার, সূত্র বা পরিত্রাণ পাঠ প্রভৃতি। এসব অনুষ্ঠানে আতীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও এলাকার লোকজন সমবেত হয়। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। তাই এ অনুষ্ঠানগুলোরও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবের যথাযথ মর্যাদার সাথে প্রতিপালন করা হয়। স্ব স্ব ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের পাশাপাশি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন করা প্রয়োজন।

অনুশীলনযূক্ত কাজ

বৌদ্ধ ধর্মীয় কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের নাম লেখ।

পাঠ : ২

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল

ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সর্বজনীন। সম্মিলিতভাবেই এসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। ফলে এসব অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল অনেক। যেমন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। ধর্মকথা শ্রবণ করে অস্থির মন শান্ত, প্রসন্ন ও উদার হয়। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাহাত হয়। কঠিন ধর্মবাণী বুঝতে সহজ হয়। পুণ্য অর্জিত হয়। দান চিন্তা উদয় হয়। নৈতিক চরিত্র গঠন হয়। দয়াপরায়ণ ও পরোপকার করতে উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

এখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল সম্পর্কে একটি কাহিনী তুলে ধরব। থেরী উত্তমা পূর্বজন্মে এক ধনশালীর গৃহপরিচারিকা ছিলেন। সেই ধনশালী প্রতু সব সময় নানা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। একদিন উত্তমা অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে প্রভুর ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় শ্রদ্ধাচিত্তে অনুষ্ঠানের সকল কাজ সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি মনে মনে কামনা করেন, ভবিষ্যতে তিনিও যেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন দাতা হতে পারেন। এই সুক্রিতি ও শুভ কামনার ফলে গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবণীনগরের এক ধনীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচুর দান করতেন এবং মহান দাতা হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাই সকলের একাগ্রচিত্তে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা উচিত।

বুদ্ধের সময় শ্রাবণীর একটি এলাকার অধিবাসীরা একটি সর্বজনীন ধর্মোৎসব আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহা উৎসাহে সকলে কাজে লেগে গেল। চতুর্দিকে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হলো। তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের নিমগ্ন জানানো হলো। অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল অন্ন-পানীয় দিয়ে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করা। যথাসময়ে সকল আয়োজন সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠানের দিন বুদ্ধ তাঁর শিষ্যসহ অনুষ্ঠান মণ্ডপে উপস্থিত হলেন। সকলে মিলে তাঁদের অন্ন-পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করল। নিজেরাও দুপুরের খাবার খেল। তারপর শুরু হলো ধর্মালোচনা সভা। এসময় আয়োজকদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ি ফিরে গেল। কেউবা গল্পগুজব আরম্ভ করল। কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়ল। কিছু

ଲୋକ ଅନ୍ୟମନକ୍ଷ ହିଲ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଚିତ୍ତେ ଧର୍ମଲୋଚନାୟ ମନୋନିବେଶ କରଳ ମାତ୍ର କରେକଜନ । ବୁଦ୍ଧଶିଷ୍ୟଙ୍କା ବିଷୟଟି ଲକ୍ଷ କରଲେନ । ତାରା ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ଏତ ବଡ଼ ଧର୍ମନୂଠାନେର ଆଯୋଜନ କରେ ଏଲାକାବାସୀ ନିଜେରୀ କେବେ ଧର୍ମ ପ୍ରବଣେ ଅପାରଗ ହେଲୋ? ଉତ୍ତରେ ବୁଦ୍ଧ ବଲଲେନ, ‘ଧର୍ମାଚରଣେର ଆନନ୍ଦ ସକଳେ ଲାଭ କରାତେ ପାରେ ନା । ଧର୍ମର ରସବୋଧ ଉପଲବ୍ଧିତେ ଜ୍ଞାନେର ପ୍ରଯୋଜନ ହୁଏ । ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଯେମନ ସକଳେ ପାଡ଼ି ଦିତେ ପାରେ ନା, ତେମନି ଧର୍ମପଥ ପାଡ଼ି ଦିତେ ପାରେ ଅଛି କରାଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର । ଯାରା ଏକାଶ୍ରାଚିତ୍ତ ଓ ସଚେତନ, ତାରାଇ ପାରେ ଜୀବନେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ କରାତେ ।’ ତାଇ ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧାଚିତ୍ତେ ଏକାଶ୍ରାଚିତ୍ତର ସାଥେ ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର-ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଯୋଗଦାନ କରା ଉଚିତ ।

ଅନୁଶୀଳନମୂଳକ କାଜ

ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର-ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଯୋଗଦାନେର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ଟି ସୁଫଳ ବଳ ।

ପାଠ : ୩

ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମା

ବୈଶାଖ ମାସେର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତିଥିରେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ନାମେ ଖ୍ୟାତ । ଏ ଦିନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ହିମାଲୟେର ପାଦଦେଶେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାକ୍ୟରାଜ୍ୟେ ରାଜ୍ୟପୁତ୍ର କୁଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ପେଉତିଶ ବହୁ ବୟବସେ ତିନି ଏକଇ ତିଥିତେ ବୁଦ୍ଧଗ୍ରାହୀର ବୋଧିବୃକ୍ଷମୂଳେ ବୋଧିଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଲାଭ କରେନ । ଆଶି ବହୁ ବୟବସେ ଏକଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତିଥିତେଇ କୁଶୀନଗରେ ତିନି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେନ । ବୋଦ୍ଧ ଧର୍ମୀୟ ଭାଷାର ଏଟିକେ ମହାପରିନିର୍ବାପ ବଲେ । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧର ମହାଜୀବନେର ଏହି ତିନାଟି ମହାନ ସଟନା ବୈଶାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତିଥିତେ ସଂଘଟିତ ହେଲେହି । ତାଇ ବୈଶାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାକେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଓ ବଲା ହୁଏ । ବୌଦ୍ଧଦେର କାହେ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ପୁରୁଷ ସବଚେଯେ ବେଶ । ନାଲା ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର-ଅନୁଷ୍ଠାନେର ମାଧ୍ୟମେ ଜ୍ଞାକଜମକ୍ରେ ସାଥେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ପାଲନ କରେ ଥାକେ ।



ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଯ ପୂଜାର ଉପକରଣ ନିଯେ ଉପାସକ-ଉପାସିକା ବିହାରେ ଯାଚେନ

সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে সূত্র পাঠ ও বুদ্ধকীর্তনের মাধ্যমে প্রভাতফেরি করে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবের সূচনা হয়। আগের দিন বৌদ্ধ বিহারগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নানা রকম ফুল, পাতা ও রাণি কাগজ দিয়ে সাজানো হয়। এভাবে অনুষ্ঠানে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়। পূর্ণিমার দিন সকালে বুদ্ধ পূজা, সমবেত উপাসনায়, পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করা হয়। দুপুর বারটার আগে ভিক্ষুসম্পত্তিকে দুপুরের আহার দান করা হয়, যা পিণ্ডদান নামে পরিচিত। দায়ক-দায়িকরাও দুপুরের আহার সম্পত্তি করে বৌদ্ধ বিহারে ধ্যান সমাধি করেন। বিকালে ধর্মসভা হয়। এতে গৌতম বুদ্ধের জীবন, ধর্ম, দর্শন বিষয়ে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা, বুদ্ধকীর্তন হয়। আজকাল অনেক বৌদ্ধ বিহারে এ উপলক্ষে রাত্নদানের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে মরণোত্তর চোখ দান করার প্রতিশুতি দেন, যা অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করে। সন্ধ্যায় অনেক বৌদ্ধ বিহারে ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে ধর্মালোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্পদায়ের লোকেরা অংশগ্রহণ করে। এতে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে উঠে, পরম্পরার প্রতি মৈত্রীভাব সৃষ্টি হয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত বুদ্ধের জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনা প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। এ ঘটনাগুলো রাজপ্রাসাদের বাইরে প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঘটেছিল। যেমন, জন্ম হয়েছিল লুমিনী কাননে। এটি বর্তমানে নেপালের অন্তর্গত। গাছপালা তরঙ্গতায় ভরা ছিল লুমিনী কানন। বুদ্ধত্ব লাভ হয়েছিল গয়ার উন্মুক্ত বোধিবৃক্ষমূলে। এটি বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গয়া জেলায় অবস্থিত।

মহাপরিনির্বাণ হয়েছিল হিরণ্যবতী নদীর তীরস্থ কুশিঙ্গরের জোড়া শালবন্ধের মূলে। তাই প্রকৃতির প্রতিও মৈত্রী প্রদর্শন করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা ছেঁড়া ও ডালপালা কাটা উচিত নয়। বিদ্যালয় ও বাড়ির আঙিনার আশেপাশে গাছের পরিচর্যা করা সকলের উচিত। প্রকৃতির সাথে আমাদের জীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসটি ‘বৈশাখ ডে’ নামে উদয়াপিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

তোমার এলাকার বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধ পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের
একটি দিনব্যাপী কর্মসূচি তৈরি কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিই আষাঢ়ী পূর্ণিমা নামে খ্যাত। গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। এগুলো হলো মাত্গর্ভে প্রতিসম্মিল গ্রহণ, গৃহত্যাগ এবং প্রথম ধর্ম প্রচার।

কথিত আছে যে, এ শুভ পূর্ণিমা তিথির রাতে শাক্যরাজ্যের রানি মায়াদেবী একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, দেবতারা তাঁকে একটি মনোরম পালকে করে অনোবতঙ্গ হৃদের তীরে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরই একটি সাদা হাতি ডানদিক দিয়ে তাঁর শরীরে একটি শ্রেতপদ্ম প্রবেশ করিয়ে দেয়। পরদিন রানি রাজা শুন্দেশদনকে তাঁর সুন্দর স্বপ্নটি বর্ণনা করেন। রাজা শুন্দেশদন জ্যোতিষীদের ডেকে স্বপ্নের কারণ জানতে চান। জ্যোতিষীরা বলেন, মহারাজ শীত্রাহ পুত্রসন্তান লাভ করতে যাচ্ছেন এবং এই ভাষ্যী পুত্রসন্তানই হবেন মহাজননী বুদ্ধ। এ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থ মাতৃজ্ঞানে প্রতিসম্মিল গ্রহণ করেন।

এমনই এক আবাঢ়ী পূর্ণিয়া তিথিতে সংলাঙ্গের সকল তোগ বিলাস ভ্যাপ করে দুর্ঘ মুক্তির পথ অবেষ্টণে তিনি পৃথক্কাল করেন। এ সময় সিদ্ধার্থ সৌভাগ্যের বঙ্গস হয়েছিল উন্নতিপ বাহয়। বাজ্য ও জীপ্তের যামাভ্যাপ করে তিনি রাজবাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। এ ঘটনাটি “মহাত্মিকদশ” নামে বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিচিত। মহাত্মিকদশ বলতে বুদ্ধের পৃথক্কালকে বোঝায়।

বুদ্ধ লাজের পর আরো এক আবাঢ়ী পূর্ণিয়া তিথিতে তিনি সারবাবে পঞ্চবৰ্ণীর শিখাদের মাঝে অব্য ধর্ম প্রচার করেন। পঞ্চবৰ্ণীর শিখারা হলো : কোষ্ঠ, বর্ণ, অঙ্গীর, সহানুম ও অঙ্গীরিত। বুদ্ধের অংগীরিত অব্য ধর্মবাচীকে কলা হয় ‘ধর্মচক্র ধর্মচক্র সূজ’। জীবজগতের কলাপে তিনি আবাঢ়ী পূর্ণিয়া তিথিতে এই সূজ দেখায় করেছিলেন। মুস্তক যথুন জীবনের সূতি বিজক্তি এই আবাঢ়ী পূর্ণিয়া বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ অব্যবৰ্ণীর ও বক্তীর তিথি।

এ পূর্ণিয়ার সাথে আরো কিছু ধর্মীয় বিবর সহজে বর্ণয়ে। এগুলোর অন্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১) আবাঢ়ী পূর্ণিয়া তিথিতেই ক্রৃত তৈজাসিক বর্ণায়সন্তুত পালসের শিরেশ দেশ। তবে থেকে তিনুয়া আবাঢ়ী পূর্ণিয়া থেকে কার্তিক পূর্ণিয়া পর্যন্ত তিনি মাস বর্ষাত্ত্ব পালন করে থাকেন। এ সময় তাঁরা ধর্ম-বিদ্য অব্যরেন এবং ধ্যানচর্চার ইত্য থাকেন। সে সময় অনুয়া কারণ ছাড়া কোনো তিকু নিষ বিহারের বাইরে মারিদানের ক্ষেত্রে পারেন না। এটি তিনুসের বিদ্য বিধান। ২) আবাঢ়ী পূর্ণিয়া তিথিতেই বৃন্ধ পুরুলোকগত যাতা যাওয়াসেবীকে ধর্ম দেশনার জন্য তাবতিল শরণে পদন করেন। সেখানে তিনি তিনি মাস অবস্থান করেন এবং যাতা যাওয়াসেবী ও দেবতাদের নিকট অতিথৰ্ম দেশনা করেন। ৩) আবাঢ়ী পূর্ণিয়া তিথিতেই প্রিয় বস্তক প্রদৰ্শন করেন।



তিনুয়া বিহারে ধ্যানচর্চা রূপ

বুদ্ধপূর্ণিমার মতো, এ পূর্ণিমা তিথিতেও উপাসক-উপাসিকাগণ বিহারে সমবেত হন। ভিক্ষুদের কাছ থেকে তাঁরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করেন। যাঁরা অষ্টশীল গ্রহণ করেন, তাঁরা ঐ দিন উপোসথ পালন করেন। এ সময় ভিক্ষুরা উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশে ধর্ম দেশনা করেন। এতে গৃহীদের মধ্যে ধর্মভাব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া একসাথে সম্মিলিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্ম চর্চা করার কারণে নিজেদের মধ্যেই সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে উঠে এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

ভোর থেকেই আষাঢ়ী পূর্ণিমার উৎসব শুরু হয়। দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে উঠে বৌদ্ধ বিহার। সম্মায় প্রদীপ পূজা, বুদ্ধকীর্তন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় সমগ্র কর্মসূচি। অনেকে এ তিথিকে উপলক্ষ করে নিজ বাড়িতে বসে রাত পর্যন্ত বিদর্শন তাৎক্ষণ্যে করেন। আবার অনেকে তিন দিন বা এক সপ্তাহের জন্য ধ্যান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সংযুক্তি বুদ্ধের জীবনের তিনটি ঘটনা বর্ণনা কর।

পাঠ : ৫

মধু পূর্ণিমা

দান, সেবা ও ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল মধু পূর্ণিমা তিথি। তাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিকেই বলা হয় মধু পূর্ণিমা। এরূপ নামকরণের ক্ষেত্রে দানের একটি কাহিনী রয়েছে, যা বৌদ্ধ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একসময় বুদ্ধ কৌশাম্বিতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয় সম্পর্কীয় একাটি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে কলহ-বিবাদের সূষ্টি হয়। ক্রমে কলহের প্রভাব কৌশাম্বির সকল আবাসিক ভিক্ষুর মধ্যে ছাড়িয়ে পড়ে। এতে ভিক্ষুরা দুইদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একসময় বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বুদ্ধ সকল ভিক্ষুদের আহ্বান করে কলহ-বিবাদ করা অনুচিত বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন। রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো বিষয়ে অনড় থাকা উচিত নয় বলে তিনি সকলকে জানান। এ উপদেশ প্রদানকালে বুদ্ধ তাদের দীর্ঘায়ু কুমারের কাহিনী বলেন। সে কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, কলহ ও রাগের প্রভাব জন্ম-জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এতে উভয়ের ক্ষতি ছাড়া কোনো মজাল হয় না। এমনকি শুধু কলহজনিত রাগের কারণে কোনো ভালো কাজও উপযুক্ত সময়ে করা যায় না। তাই সবসময় কলহ-বিবাদ পরিত্যাগ করা উচিত। বুদ্ধের নানাবিধ প্রচেষ্টা সম্বেদ কৌশাম্বিবাসী ভিক্ষুরা কলহ থেকে বিরত হলেন না। নিজেদের মধ্যে কলহ ত্যাগ করে প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করতে পারলেন না।

তখন বুদ্ধকৌশাম্বিবাসী ভিক্ষুদের সংসর্গ ত্যাগ করে নিজে একাকী নির্জন গহীন বনে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। একসময় তিনি চলে গেলেন পারিলোয় নামক বনে। ভিক্ষুদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে তিনি সেখানে স্বচ্ছদে অবস্থান করতে লাগলেন। বুদ্ধ বনের মধ্যে একটি ভদ্রশাল গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থান করছিল একটি হাতি। হাতিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের শুঁড় দিয়ে বুদ্ধের বসবাসের জায়গাটি পরিষ্কার করে দেয়। হাতিটি বুদ্ধের জন্য নিয়মিত পানীয় জলও সঞ্চাহ করে আনত। সেবা দানের জন্যে সবসময় তৎপর থাকত। এভাবে হাতিটি নিজের ইচ্ছাতেই বুদ্ধের সেবায় নিয়োজিত থাকত। বন্যপ্রাণী হাতির এরূপ সেবাপ্রায়ণতা দেখে বনের এক বানরও বুদ্ধকে সেবা করতে আগ্রহী হয়। সেই চেতনায় বানরটি অত্যন্ত শুদ্ধাসহকারে বন থেকে মধু সঞ্চাহ করে বুদ্ধকে দান করে। বুদ্ধ বানরের দেওয়া মধু সত্ত্বাটিতে গ্রহণ করেন। এতে বানর খুবই প্রীত হয়। মনের সুখে এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে লাফাতে থাকে। বানরটি আনন্দে আত্মার হয়ে লাফানোর সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বুদ্ধ দিব্যচক্ষুতে দেখলেন যে, মধুদানের ফলে বানর মৃত্যুর পর দেবগোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে। এ ঘটনাটি সংযুক্তি হয়েছিল তাদু পূর্ণিমা তিথিতে। এ অনন্য ঘটনাকে শরণ করে বৌদ্ধরা এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুসংঘকে মধু দান করে।

এসব কারণে ভাদ্র পূর্ণিমাকে মধু পূর্ণিমা বলা হয়। এছাড়া কৌশামির তিক্তুরাও নিজেদের ভূল বুঝতে পেরে কলহ ত্যাগ করেন এবং পারম্পরিক মধুময় সমর্পক সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।



বানর বুদ্ধকে মধু দান করছে

এ পূর্ণিমায় যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তা প্রায় অন্যান্য পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের মতো। মধু দান করা এ পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ তিথিতে বৌদ্ধরা বুদ্ধ ও তিক্তুদের উদ্দেশে মধু দান করে। বিহারে আগত উপাসক-উপাসিকারা পরম্পরাকে মধু ও পানীয় দিয়ে আগ্রহ্যন করে। এভাবে দান ও সেবার ঐতিহ্যকে ধারণ করেই মধু পূর্ণিমা পালন করা হয়।

অনুশীলনযুদ্ধক কাজ
মধু পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

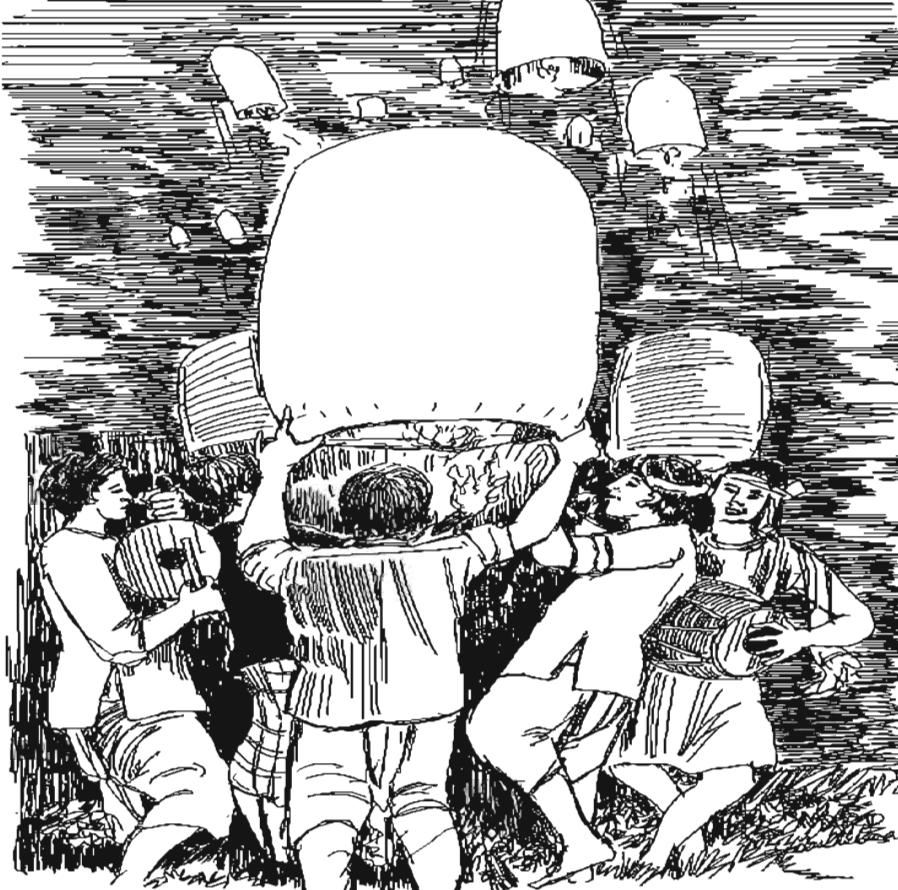
পাঠ : ৬

প্রবারণা পূর্ণিমা

প্রবারণা পূর্ণিমা আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিই প্রবারণা পূর্ণিমা। অন্যান্য পূর্ণিমার মতো এ পূর্ণিমা তিথির সঙ্গেও বৃক্ষের জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা জড়িত আছে। যেমন, এ পূর্ণিমা তিথিতেই বৃক্ষ মাতাকে এবং দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিঃস স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত পালন সমাপ্ত হয়। এ পূর্ণিমা তিথিতে বৃক্ষ ভিক্ষুদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘ভিক্ষুগণ! বহুজনের মঙ্গলের জন্য, হিতের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছাড়িয়ে পড়। প্রচার কর সেই ধর্ম, যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ।’ এ পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলা হয়।

‘প্রবারণা’ শব্দের অর্থ হলো সন্তুষ্টি বা ইচ্ছার পূর্ণতা, উৎসব, বরণ করা, বারণ করা ইত্যাদি। কৃশ্ণসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা এবং অকৃশ্ণসমূহ বারণ করাই হচ্ছে প্রবারণা। বর্ষাবাসন্তের সমাপ্তি এবং মাসব্যাপী কঠিন চীবরদান উৎসবের সূচনা করে বলে প্রবারণাকে বৌদ্ধদের আনন্দের দিনও বলা হয়।

বর্ষাবাসন্তের সমাপ্তি, কঠিন চীবরদান উৎসবের শুরু, ভূল-ভুচি ক্ষমা প্রার্থনা করে পরিশুক্ষিতা অর্জন, অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিঃস স্বর্গ থেকে বৃক্ষের প্রত্যাবর্তন, বৃক্ষ কর্তৃক যমক ঝক্কি প্রদর্শন প্রভৃতি কারণে প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধ জগতে একটি অনন্য স্মরণীয় উৎসব।



ফানুস উত্তোলন অনুষ্ঠান

প্রবারণা পূর্ণিমা একটি উৎসবমুখর দিন। এদিনে ফানুস ওড়ানো হয়। বিশেষ করে ফানুস বানানোর জন্য পূর্ণিমা তিথির কয়েকদিন আগে থেকেই বৌদ্ধ গ্রামসমূহে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও প্রদীপ পূজার পর বৌদ্ধ বিহারে ফানুস ওড়ানোর উৎসব শুরু হয়। অনেকে বাড়ির উঠানেও ফানুস উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবে বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্বস্তরের লোক উপস্থিত হয় এবং ফানুস ওড়ানো উপভোগ করে। নানা রকম বাদ্যবাজনার তালে তালে, সংকীর্তনের বাংকারে নেচে-গেয়ে বর্ণিল ফানুস আকাশে ওড়ানো হয়। রাতে এ দৃশ্য অপূর্ব মনে হয়। এভাবে প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠান সর্বজনীন উৎসবে পরিগত হয়।

এ পূর্ণিমা উদ্ধাপনে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, প্রত্যেক মানুষকে সর্বদা নির্দোষ ও পবিত্র থাকার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে। এজন্যে চেষ্টা করতে হবে। যেমন: প্রবারণা পূর্ণিমায় বৌদ্ধভিক্ষুরা ভিক্ষুসীমায় বসে পরম্পরের কাছে দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এটি হলো আত্মশুद্ধির প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নিজের মন পবিত্র হয় এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদেরও দোষ-ত্রুটির জন্য পরম্পরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এতে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মনের রাগ ও হিংসা দূর হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রবারণা পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ ভিক্ষুদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন?

পাঠ : ৭

মাঘী পূর্ণিমা

বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহের মধ্যে মাঘী পূর্ণিমাও গুরুত্বপূর্ণ। এ পূর্ণিমার সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত আছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মহাপরিনির্বাণ লাভের ঘোষণা। এ তিথিতে বুদ্ধ নিজের আয়ু সংক্ষার বিসর্জন বা মহাপরিনির্বাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি ভিক্ষুসঙ্গকে বলেছিলেন, ‘এখন হতে তিন মাস পর আগামী বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আমি পরিনির্বাণ লাভ করব।’ এভাবে নিজের জীবন অবসানের দিনক্ষণ ঘোষণা করা সাধারণের জীবনে বিরল। জগতে হয়তো আর দ্বিতীয়টি নেই।

স্থাভাবিক দৃষ্টিতে বুদ্ধের জীবন অবসানের ঘোষণার জন্য এই দিনটি শোকের বা দুঃখের মনে হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে এটি মহৎ ও মহান একটি দিন। কারণ বুদ্ধ বলেছেন, উৎপন্ন সকল কিছুই বিনাশ অনিবার্য। অর্থাৎ জন্ম হলেই মৃত্যু হবে। জগতের সকল কিছুই অনিত্য ও অনাত্মা নিয়মে বাঁধা। বুদ্ধ এই সত্যকে সাধনা ও প্রজ্ঞা দ্বারা আবিষ্কার করেছিলেন। নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তিনি সম্যক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি তাঁর আয়ু সংক্ষার ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্য সকল পূর্ণিমা উৎসবের মতো মাঘী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানমালাও খুব সকাল থেকে শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানে পঞ্চশীল ও উপোসথশীল গ্রহণ, বুদ্ধ পূজা, সমবেত উপাসনা, দেশ, জাতি ও বিশ্ববাসীর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। এছাড়া ধর্মালোচনা, সান্ধ্যকালীন বন্দনা ও পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. যে অনুষ্ঠানগুলো চান্দ্ৰবছরের নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো ধৰ্মীয় বা ।
২. 'কঠিন চীবৱদান' অনুষ্ঠান কৰতে হয় বছরের নির্দিষ্ট ।
৩. বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিই নামে খ্যাত ।
৪. ভিক্ষুসজ্জাকে দুপুরের আহার দান কৰাকে বলে ।
৫. ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিকেই বলা হয় ।

মিলকৰণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো	ধৰ্মচক্র প্ৰবৰ্তন সূত্ৰ ।
২. সকলের একাগ্ৰচিন্তে	জীবনেৰ সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য ।
৩. প্ৰকৃতিৰ সাথে আমাদেৱ	মহারাজ শীঘ্ৰই পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰতে যাচ্ছেন ।
৪. জ্যোতিষীৱা বলেন	প্ৰধানত পূর্ণিমাকেন্দ্ৰিক ।
৫. বুদ্ধেৰ প্ৰচাৱিত প্ৰথম ধৰ্মবাণীকে বলা হয়	ধৰ্মীয় আচাৱ-অনুষ্ঠান পালন কৱা উচিত ।

সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন

১. কোন মাসের পূর্ণিমা তিথিকে মধু পূর্ণিমা বলা হয়?
২. বুদ্ধ পূর্ণিমা কোন মাসে কীভাৱে অনুষ্ঠিত হয়?
৩. ফানুস উত্তোলন উৎসবেৰ পৱিত্ৰ দাও ।
৪. প্ৰবাৱণা পূর্ণিমাৰ দিন বুদ্ধ ভিক্ষুদেৱ কী নিৰ্দেশ দিয়েছিলেন?

বৰ্ণনামূলক প্ৰশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবেৰ পৱিত্ৰ লিপিবদ্ধ কৱ ।
২. বুদ্ধ পূর্ণিমা উদ্যাপনেৰ কাৱণসমূহ আলোচনা কৱ ।
৩. প্ৰবাৱণা পূর্ণিমাৰ শিক্ষা আমাদেৱ জীবনে যে যে উন্নয়ন আনতে পাৱে তা আলোচনা কৱ ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধের জীবনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কয়টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল?

ক. ২

খ. ৩

গ. ৪

ঘ. ৫

২. ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সর্বজনীন হয় কেন?

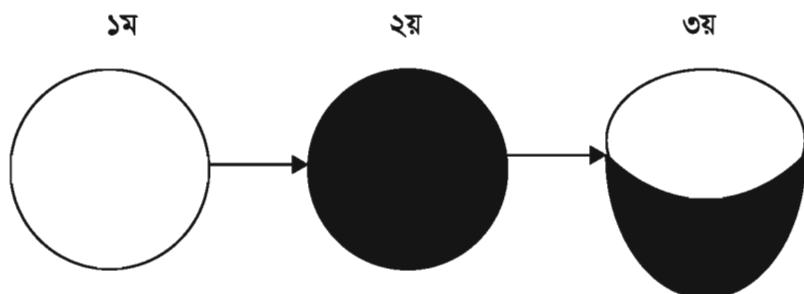
ক. আত্ম বন্ধনের জন্য

খ. সবার সাথে দেখা করার জন্য

গ. একতাবন্ধ হওয়ার জন্য

ঘ. পারম্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য

নিচের মডেলগুলো দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্র : সময়ের ভিত্তিতে চাঁদের প্রকৃতি

৩. ১ম মডেলটি কী ইঙ্গিত বহন করছে?

ক. পূর্ণিমার

খ. কৃক্ষণ অঞ্চলীয়

গ. শুক্রা অঞ্চলীয়

ঘ. অমাবস্যার

৪. ৩য় মডেলের আলোকে গৃহীতা অনেকে কী করে থাকে?

ক. ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন

খ. অঞ্চলীয় গ্রহণ ও পালন

গ. তীর্থস্থান দর্শন

ঘ. ধর্মীয় আলোচনা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ঘটনা-১

তিক্তুরা এক পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষাক্রত পালনের জন্য বিহারে সমবেত হলেন। ঠাঁরা সম্মিলিতভাবে বুদ্ধ পূজা ও উপাসনার মাধ্যমে উপোসথ শীল গ্রহণ করেন। দুপুরে ধ্যান সমাধির চর্চা করেন। ধর্মদেশনার একপর্যায়ে ভন্তে বলেন, এ পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থ মাতৃজর্জরে প্রতিসম্মিথ গ্রহণ, গৃহত্যাগ ও সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন।

ঘটনা-২

বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাজরী মার্মা একদিন সম্ম্যায় ফানুসবাতি উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগদান করে। কৌতুহলবশত সে তার বাবার কাছে জানতে চাইল, বুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। উভরে বাবা বলেন, এ তিথিতে বুদ্ধ মাতাকে এবং দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিংস স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। এছাড়া উক্ত দিবসে ভিক্ষুদের বর্ষাবাস পালন সমাপ্তি হয়।

- ক. বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের কথা কোন পূর্ণিমায় ঘোষণা করেন?
- খ. বানরের মধুদানের ঘটনাটি উল্লেখ কর।
- গ. ঘটনা-১ -এর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন পূর্ণিমার ইঙ্গিত বহন করে। ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ঘটনা-২ ‘প্রবারণা পূর্ণিমার প্রতিচ্ছবি’ -তুমি কি এর সঙ্গে একমত? যুক্তি প্রদর্শন কর।

২.

অনিবার্য বড়ুয়া একজন চাকরিজীবী। ছুটির দিনের এক সকালে বিহারে গিয়ে তিনি সূত্রপাঠ ও বুদ্ধ কীর্তনের মাধ্যমে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধ পূজা প্রদান করে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। দুপুর বারোটার আগে ভিক্ষুসভ্যকে পিণ্ডান করেন এবং বিকালে ধর্মসভায় বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ তিনটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা হয়।

- ক. প্রবারণা শব্দের অর্থ কী?
- খ. মাঘী পূর্ণিমার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের সাথে কোন পূর্ণিমার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. অনিবার্য বড়ুয়া উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে কী সুফল লাভ করবে?
পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

চরিতমালা

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কেউ চিরদিন এ জগতে বেঁচে থাকেন না। মানুষের কর্মই মানুষকে অমরত্ব দান করে। পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের আলোয় জগৎ আলোকিত হয়েছে। এজন্য মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে এবং ভক্তি করে। তাঁদের নির্মল চরিত্র সহজেই মানুষের হন্দয় জয় করে নেয়। জ্ঞানে, গুণে ও কর্মে তাঁরা মহান। এ সকল মহৎ ব্যক্তির জীবন সকলের অনুকরণীয়। মহৎ মানুষের জীবনকথা সংজীবন যাপনের প্রেরণা যোগায়। এ অধ্যায়ে আমরা কয়েকজন থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনী পড়ব এবং তাঁদের অবদান সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

* জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।

* থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের পরিচয় দিতে পারব।

পাঠ : ১

জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মহৎ ও আদর্শসম্পন্ন জীবনচরিত মানুষকে আকৃষ্ট করে। আদর্শিক জীবন গঠনে প্রেরণা যোগায়। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এরপ জীবন অর্জিত হয়। থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। এতে অনেক অনুশীলনীয় বিষয় রয়েছে, যা সকল শ্রেণি-পেশা ও বয়সের মানুষকে সৃষ্টিশীল কল্যাণ চেতনায় উদ্বৃদ্ধ করে।

জগতে সহজে কিছু লাভ করা যায় না। একাহাতা, অধ্যবসায়, ত্যাগ ও সংযম ছাড়া মহৎ জীবন গঠন করা সম্ভব নয়। চরিত্রের এই গুণগুলো জীবনের গতির সাথে ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়। থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিত পাঠে দেখা যায়— তাঁদের জীবনেও সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না ও বেদনা ছিল। কিন্তু তাঁরা কখনো আনন্দে বিভোর ও দুঃখে বিমর্শ হয়ে আদর্শচূর্ণ হননি। নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষাই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা ছিলেন মহৎ ও মহানুভব। আমাদের জীবনও সুন্দরভাবে গঠন করার লক্ষ্যে তাঁদের জীবনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এগুলো পাঠের মাধ্যমে আমাদের আদর্শিক চেতনা ও নৈতিকবোধ আরো সমৃদ্ধ হবে। তাই থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিত পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

ত্রিপিটক সাহিত্যে অনেক নারী-পুরুষের জীবনী পাওয়া যায়, যাঁরা কর্মগুণে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হয়েছেন। ভিক্ষুদের থের আর ভিক্ষুণীদের থেরী বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অনেক অবদান রয়েছে। থেরদের মধ্যে উপালি ও আনন্দ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। থেরীদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, কৃশাগৌতমী, ক্ষেমা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এছাড়া অনেকে গৃহীজীবন যাপন করে বৌদ্ধধর্মের সেবা করেছেন। ধর্ম প্রচার করতে সাহায্য করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা বিশিষ্ট বৌদ্ধ উপাসক নামে খ্যাত। এঁদের মধ্যে রাজা বিমিসার, অজ্ঞাতশত্রু, অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা, সুজাতা, মল্লিকা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

কয়েকজন বৌদ্ধ থের-থেরীর নাম বল।

পাঠ : ২

উপালি থের

উপালির জন্ম কপিলাবস্তুর নিম্নকূলের নাপিত বহশে। তাঁর গৃহী নাম ছিল পূর্ণ। তাঁর মাতার নাম ছিল মত্তানী। পূর্ণ ছিলেন অনুগ্রাম্য, ভূগু, কেশ্বিল, ভদ্রীয়, আনন্দ, দেবদস্ত প্রমুখ রাজপুত্রের সহচর।

বুধ এক সময়ে অনুগ্রাম্য নামক স্থানের আম্ববনে অবস্থান করছিলেন। সে সময় কয়েকজন রাজপুত্র ঠিক করলেন তাঁরা একত্রে বুদ্ধের নিকট গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। এই ভেবে একদিন তাঁরা বুদ্ধের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পূর্ণও তাঁদের সঙ্গী হলেন। কপিলাবস্তু থেকে কিছু দূরে এসে তাঁরা থামলেন। তারপর সকলে নিজেদের মূল্যবান পোশাক খুলে পূর্ণের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা বললেন, ‘পূর্ণ! এসব তোমাকে দিলাম। তুমি কপিলাবস্তুতে ফিরে যাও।’ এ বলে রাজপুত্ররা চলে গোলেন। পূর্ণ তখন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গোলেন। ভাবতে শাগলেন, কপিলাবস্তুতে ফিরে গিয়ে রাজপুত্রদের সংসার ত্যাগের কথা কীভাবে জানাবেন? তিনি আরও ভাবলেন, নাপিত বহশে আমার জন্ম। এই মূল্যবান পোশাক আমার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া তাঁরা রাজপুত্র। তাঁদের বিপুল অর্ধ, ধনসম্পদ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে। এসব ছেড়ে তাঁরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারলে আমি কেন পারব না? আমার তো কিছুই নেই। এ বলে তিনি মূল্যবান পোশাকগুলো একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে



রাজপুত্ররা পূর্ণকে পোশাক ও অলঙ্কার খুলে দিচ্ছেন

রাজকুমারদের পথে পা বাঢ়ালেন। ইতোমধ্যে অনুরূপ, ভূগু, আনন্দ প্রযুক্ত রাজকুমারগণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রার্থনা জানালেন। এমন সময় পূর্ণও এসে বুদ্ধকে বসনা করে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। তখন রাজকুমারগণ বুদ্ধকে অনুরোধ করে বললেন, ‘তত্ত্বে! আগে পূর্ণকে প্রব্রজ্যা দিন। তাহলে তাকে আমরা প্রণাম ও সম্মান করতে বাধ্য হবো। এতে আমাদের বশ্রমর্যাদা ও অহংকার দূর হবে।’

তাঁদের অনুরোধ শুনে বুদ্ধ খুশি হলেন। বুদ্ধ প্রথমে পূর্ণকে এবং পরে রাজকুমারদের প্রব্রজ্যা দান করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার পর পূর্ণের নাম হয় উপালি।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের কয়েকদিন পরই উপালি বুদ্ধের নিকট অরণ্যে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁকে বুদ্ধের সঙ্গে থেকে ধর্ম বিনয় অনুশীলন করতে বললেন। উপালি বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে অতি অল্প সময়ে অর্হত্ব ফল লাভ করতে সমর্থ হলেন। বুদ্ধের সঙ্গে থেকে উপালি বিনয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিনয়ে দক্ষতা দেখে বুদ্ধ তাঁকে ‘বিনয়ধর’ (নৈতিজ্ঞনে সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে ঘোষণা করেন।

একদিন উপোসথ দিবসে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উপালি ভিক্ষুদের নিম্নরূপ উপদেশ দান করেন, “প্রথম শিক্ষার্থী নব প্রবৃজিত কর্মফল ও রাত্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে গৃহ হতে বের হয়ে শুন্ধ জীবন যাপনকারী, শোর্যবান কল্যাণমিত্রের নিকট উপস্থিত হবেন। সঙ্গের মধ্যে বাস করবেন। জ্ঞানী ভিক্ষু বিনয় শিক্ষা করবেন। যোগ্য অযোগ্য বিষয়ে সুদক্ষ হবেন এবং তৃষ্ণা উৎপাদন না করে বাস করবেন।”

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর আয়োজিত প্রথম মহাসঙ্গীতিতে উপালি বিনয় আবৃত্তি করেন। সেই মহাসঙ্গীতিতে শাচক্ষত মহাজ্ঞানী অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উপালির আবৃত্তি করা বিনয়ের যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরে এগুলো বিনয়পিটক নামে সংকলিত করা হয়। বুদ্ধ প্রদত্ত বিনয়ধর অভিধার মর্যাদা রাখতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এটি তাঁর জীবনের পরম গৌরব। প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে মানুষের জীবনে অনেক কিছু করা সম্ভব। এর জন্য বশ্রমর্যাদার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সৎ কর্ম করার প্রচেষ্টা। উপালি থের'র জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই।

অনুশীলনমূলক কাজ

উপালির সঙ্গে যাঁরা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন, তাঁদের নামগুলো লেখ (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৩

আনন্দ থের

আনন্দের জন্ম শাক্যরাজ বংশে। তিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থের কাকাতো ভাই ছিলেন। তাঁর পিতার নাম অমিতোদন। সিদ্ধার্থ ও আনন্দ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপ, ভূগু, ভদ্রীয় ও অন্যান্য শাক্য রাজকুমারদের সাথে তিনি একই দিনে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। আনন্দ সুপ্রবুদ্ধ ছিলেন। তিনি বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং আটটি শর্তের মাধ্যমে বুদ্ধের প্রধান সেবকের পদ লাভ করেছিলেন। তিনি তালো বস্তা ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য ও সুন্দর ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন।

বুদ্ধের বয়স যখন ৫৫ বছর, তখন তাঁর একজন স্থায়ী সেবকের দরকার হয়। সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ান এবং আনন্দসহ অনেকেই বুদ্ধের সেবক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বুদ্ধ জানতেন, আনন্দ কল্পকাল ধরে এই পদের জন্য পুণ্য সংরক্ষণ করে আসছেন। আনন্দ তখন মাত্র স্নোতাপস্তি ফল লাভ করেছিলেন। বুদ্ধ তাই আনন্দ ২০^১ থেরকে সেবক পদে নিযুক্ত করেন। সেদিন থেকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত আনন্দ সব সময় বুদ্ধের সঙ্গে ছিলেন। তথাগত বুদ্ধ আনন্দকে সম্মোধন করে ভিক্ষুসঙ্গের উদ্দেশ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন।

এসব উপদেশ ‘মহাপরিনির্বাণ’ সূত্রে পাওয়া যায়। আনন্দ থের অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বুদ্ধের সেবা করতেন। বুদ্ধ যখন উপদেশ দিতেন, তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। সব উপদেশ মনে রাখতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই প্রথম। তিনি বুদ্ধের যেকোনো উপদেশ প্রয়োজনে হুবহু অন্যকে বলতে পারতেন। এ জন্য তিনি ‘ধর্মভাণ্ডারিক’ ও ‘শুতিধর’ ভিক্ষু নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অল্পকাল পরেই রাজগৃহের সম্পর্গী গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। মহাসঙ্গীতিতে একমাত্র অর্হৎ ভিক্ষুদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। তবে বুদ্ধের সেবক ও শুতিধর হিসেবে আনন্দের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত ছিল। এ আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দ মহাসঙ্গীতির পূর্বরাতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। সেই রাতেই তিনি অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন। অর্হত্ব লাভ করে তিনি ভিক্ষুদের অনেক উপদেশ প্রদান করেন। নিম্নে দুটি উপদেশ তুলে ধরা হলো :

১। কর্কশ বাক্যাবী, ক্রোধী, অহংকারী এবং সংঘতেদকারী ব্যক্তির সঙ্গে বস্ত্রুত্ব করবে না,

তাদের সঙ্গী হওয়া উচিত নয়।

২। শ্রদ্ধাবান, শীলবান, জ্ঞানবান ব্যক্তির সঙ্গে বস্ত্রুত্ব করবে। তাঁদের সঙ্গ উভয়।

এদিকে মহাসঙ্গীতি উপলক্ষে সম্মেলনকক্ষে সকল অর্হৎ ভিক্ষু সমবেত হন। শুধু আনন্দ থের ছিলেন অনুপস্থিত। মহাসঙ্গীতি শুরু হলো। হঠাতে সকলেই দেখলেন আনন্দ তাঁর আসনে বসে আছেন। সকলের মন খুশিতে ভরে উঠল। কথিত আছে, তিনি আকাশপথে এসে তাঁর জন্য রাখা নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম মহাসঙ্গীতিতে আনন্দ ধর্ম (সূত্র ও অতিধর্ম) আবৃত্তি করেছিলেন।

ভিক্ষুণী সঙ্গ প্রতিষ্ঠায় আনন্দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মহারাজ শুদ্ধেদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রবৃজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে এতে সম্মত হননি। পরে আনন্দের প্রবল অনুরোধে নারীদেরও সঙ্গে প্রবেশাধিকার অনুমোদন করেন। সে সময়ে নারীদের ভিক্ষুণী পদের মর্যাদা প্রদান করা খুবই কঠিন ছিল। নারীদের গৃহে থাকাই ছিল সামাজিক প্রথা। তাই বলা হয়, মাতৃজাতিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিতকরণে আনন্দ থের'র ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

আনন্দ থের'র দুটি উপদেশ লেখ।

পাঠ : ৪

কৃশা গৌতমী থেরী

বুদ্ধের সময়ে কৃশা গৌতমী শ্রাবণী নগরের এক গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল গৌতমী। তাঁর দেহ অত্যন্ত কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা গৌতমী নামে অভিহিত হন। তাঁর বিবাহিত জীবনে তিনি সুখ লাভ করতে পারেননি। অনাদর-অবহেলায় কেটেছে তাঁর জীবন। অসময়ে তাঁর স্বামীও মৃত্যুবরণ করেন। গোকে তাঁকে অনাথা বলত। কিন্তু এক পুত্রসন্তান প্রসব করে তিনি সম্মান লাভ করেন। পুত্রাচার্চি ছিল তাঁর একমাত্র আশা-ভরসা। পুত্রাচার্চি বড় হয়ে ক্ষমে কৈশোরে উন্নীর্ণ হলে হঠাতে তারও মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে পাগল হয়ে যান। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। সকলের কাছে মৃত সন্তানকে বাঁচানোর জন্য উষ্ণধ ভিক্ষা চাইলেন। উষ্ণধ কেউ দিতে পারলেন না। বরং নগরবাসী কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলে ভৎসনা করলেন। কৃশা গৌতমী কারো কথাতেই জ্ঞানে করলেন না। সন্তানকে বাঁচানোর আশায় তিনি ছুটে চললেন প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে। অবশেষে এক মহৎ ব্যক্তি তাঁকে তথাগত বুদ্ধের



মৃত হেসেকে কোলে নিয়ে কৃশ্ণ গৌতমী বুক্ষের কাছে আসছেন

আছে সিয়ে উৎসব প্রার্থনা করতে বললেন। অতঃপর কৃশ্ণ গৌতমী মৃত সন্তান কোলে নিয়ে বুক্ষের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হলে তিনি বুক্ষকে বললেন, ‘তপ্তবান। আমার সন্তানের জন্য উৎসব দিন।’ বুশ্ব কৃশ্ণ গৌতমীর দিকে তাকালেন এবং খাল চেতনার দেখলেন কৃশ্ণ গৌতমীর পূর্বজন্মের অনেক সুস্মৃতি আছে। কিন্তু এ অনেকের নানাবিধ কর্ম ও কর্মকলে তার হৃদয় কঠকে ভয়পূর্ণ। বুশ্ব তার মানবিক অশান্তি দূর করার জন্য তাঁকে বললেন; ‘নগড়ে সিয়ে ঘমন একটি শর থেকে সরিবাবীজ নিয়ে এসো, যে ঘড়ে কখনো কোনো মানবের মৃত্যু হয়নি।’ বুক্ষের কথা শুনে কৃশ্ণ গৌতমী কিছুটা শাক হন এবং মৃত পুত্রকে বুকে নিয়ে তিনি নগড়ে থেকে করেন। তিনি প্রতিটি ঘড়ের দরজায় সিয়ে সরিবাবীজ ডিঙ্কা করে ছিঁজেন করলেন, এ ঘড়ে কোনো মৃত্যু ঘটেছে কি না। সকল ঘড়ে একই উত্তর দেল, এখানে কচ মৃত্যু হয়েছে তার ইরণা নেই। তিনি বুক্ষে পারলেন, কোনো ঘড়ই মৃত্যুর কঠাল ধাই থেকে মৃত্যু নয়। ‘জন্য হলেই মৃত্যু অনিবার্য। সর্ব বহু অনিত্য।’ অতঃপর পুত্রের সংকলন করে তিনি বুক্ষের নিকট ফিরে যান। বুশ্ব ছিঁজসা করেন, ‘গৌতমী! সরিবাবীজ পেয়েছে কি? কৃশ্ণ গৌতমী বললেন, ‘ভগবান! সরিবাবীজের আর প্রয়োজন নেই। আমাকে দীক্ষা দিন।’ তখন বুশ্ব তাকে বললেন, ‘বন্যার দ্রোগ বেমন প্রাপ্ত, নগড় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি তোপকিলাসে রক্ত মানুষও মৃত্যুর মাধ্যমে অবল হয়ে যায়।’ বুক্ষের উপস্থিতি শুনে কৃশ্ণ গৌতমী দ্রোগাশতি বল শাত করে তিঙ্কুলীধর্মে দীক্ষা প্রার্থনা করেন। দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি খুব তালোভাবে তিঙ্কুলী জীবনের নিয়ম পালন করেন। সকল থেকার লোক, হিলা, যোহ, তৃকা কর করে তিনি অর্হকৃত্বাত হন। বুশ্ব তাঁকে অমসূচ বজ্র পরিধানকাঞ্জীদের ঘৰ্য্যে প্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। স্বীর সাফল্যে উপস্থিত হলে তিনি অনেক গাথা ভাবণ করেছিলেন।

উল্ল কিছু উপস্থিত নিতে ছুলে ধৰা হলো :

- ১) সাধু বাঞ্ছির সঙ্গে বস্তুত্ব করা জ্ঞানীগণ প্রশংসন করেন। সাধু বাঞ্ছির সঙ্গে বস্তুত্ব করালে জ্ঞানী হওয়া যাব।

- ২) সৎ মানুষের অনুসরণ করো। এতে জ্ঞান বর্ধিত হয়।
- ৩) চতুর্বার্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করো।
- ৪) আমি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, নির্বাণ উপলব্ধি করেছি।
- ৫) আমি বেদনা মৃত্ত, ভার মৃত্ত। আমার চিত্ত সম্পূর্ণ মৃত্ত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কৃশা গৌতমী কীভাবে বুঝালেন যে সকলে মৃত্যুর অধীন? বর্ণনা কর।

পাঠ : ৫

অভিজ্ঞাপা নন্দা

হিমালয়ের পাদদেশে ছিল কপিলাবস্তু রাজ্য। এই রাজ্যে শাক্য জাতি বাস করত। সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা শুদ্ধেদন ছিলেন শাক্যদের রাজা। শাসনকার্য পরিচালনায় সুবিধার জন্য রাজ্যটি কয়েকজন নায়কের অধীনে বিভক্ত ছিল। তেমনি এক নায়ক ছিলেন ক্ষেমক। নন্দা ছিলেন ক্ষেমকের প্রধান স্তুর কন্যা। নন্দা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় অভিজ্ঞাপা নন্দা।

নন্দা বিবাহযোগ্য হলে বহু ধনী ব্যক্তির পুত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। অনেক বিচার-বিবেচনা করার পর নন্দা এক শাক্য যুবককে পছন্দ করলেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! সেই দিনই সেই শাক্য যুবকের মৃত্যু হয়। সমাজে তখন তা অমঙ্গল হিসেবে বিবেচিত হতো। নন্দার মা-বাবা ও ভীষণ মর্মাহত হন। তাঁরা ঠিক করলেন নন্দাকে সৎসারাধর্মে আবদ্ধ না রাখতে। অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য তাঁকে প্রব্রজিত করলেন। প্রব্রজিত হলেও নন্দা তাঁর রূপের জন্য খুব অহংকার করতেন। মন্তক মুক্তিত করে ভিক্ষুণীর বেশ গ্রহণে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পরিবারের সিদ্ধান্তে বাধ্য হয়ে নন্দা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর নন্দার নতুন জীবন শুরু হলো। নন্দা এখন ভিক্ষুণী। কিন্তু ভিক্ষুণী হলেও তিনি রূপের অহংকার করতেন। উপদেশ শোনার জন্য প্রতিদিন অনেক ভিক্ষুণী বুদ্ধের নিকট যেতেন। কিন্তু নন্দা বুদ্ধের সামনে যেতে ভয় পেতেন। কারণ তিনি মনে করতেন, বুদ্ধ তাঁর মনোভাব জেনে তাঁকে সকলের সামনে ভর্তুন্ন করতে পারেন। এই ভয়ে তিনি সবসময় বুদ্ধকে এড়িয়ে চলতেন। বুদ্ধ জানতেন, নন্দা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত। তিনি নন্দাকে ডেকে আনেন। সে সময় বুদ্ধ দিব্যশক্তিতে নন্দার চেয়ে অপরূপ সুন্দরী নারীকে উপস্থিত করেন। সে নারীর সৌন্দর্য দেখে নন্দা হততন্ত্র হয়ে যান। এক দৃষ্টিতে নন্দা চেয়ে রইলেন সেই সুন্দরী নারীর দিকে। বুদ্ধ দিব্যশক্তিতে সুন্দরী নারীকে পুনরায় বৃদ্ধ, জরা, শীর্ণ অবস্থায় পরিণত করলেন। সেই দৃশ্য নন্দার মনে আঘাত করল। তাঁর রূপের মিথ্যা অহংকার নিমিষেই ধ্বনি হয়ে গেল। তখন বুদ্ধ তাঁকে অহংকার পরিত্যাগ করার জন্য উপদেশ দেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে তিনি বুঝতে পারলেন; রূপ ক্ষণস্থায়ী, অন্তরের সৌন্দর্যই চিরস্থায়ী। অতঃপর তিনি তৃষ্ণামৃত হয়ে অর্হতপ্রাপ্ত হন এবং উপদেশস্বরূপ বলেন; ‘এই দেহ অশুচি এবং ব্যাধির আলয়। এতে অহংকারের কিছুই নেই। অনিষ্টকর অহংকার পরিত্যাগ কর। মনকে শাস্ত ও সংযত কর।’

নন্দার জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে রূপের জন্য অহংকার করা উচিত নয়। সৎ জ্ঞানই মানুষের প্রম সম্পদ।



বামহ তিব্বতী অভিজ্ঞা মন্দি

অসুশীলনসমূক কাল

জগ বনবানী – কৃষ্ণ অভিজ্ঞা নমোকে কীভাবে এ শিক্ষা মিজেন? বর্ণনা কর।

অর্থথাত যদে অভিজ্ঞা মন্দি কী বলেছিলেন?

পাঠ : ৬

অঙ্গীশ দীপজ্ঞন

যুগে যুগে বালাসেশে বড় জনী পজিত ও যনীয়ী অস্ত্রাঙ্গ কর্তৃতেহন। তেজা শিখ গুণে বিদ্যুত ইতিহাসে প্রস্তাব
আসল শাত কর্তৃতেহন। আমর হয়ে আহেল শানুদের মনের ঘট্টে। সেই রূপম এক যনীয়ী অঙ্গীশ দীপজ্ঞন।
অঙ্গীশ দীপজ্ঞন বালাসেশের লোক হিসেন। ১৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রচীন চাকা জেলার অঙ্গীশ ক্ষিতিপুর প্রদেশনার
বহুবোগীয়ী ধার্ম তাঁর জন্ম। এটি বর্তমানে তাকা বিভাসের মুলিগাঁও জেলার অঙ্গীশ। অঙ্গীশের বাহুতিটাচি
এখনও বিদ্যমান।



ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ

ବ୍ୟାବୋଲିନୀର ଦେଉ ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟମରେ ନାମେ ଏକଟି ଶ୍ଵତ୍ସିତ ପ୍ରକଟିତ କରା ହାଯେଛେ । ଏଟି କଥାରେ 'ବ୍ୟାବୋଲିନୀ ମୌଳି କୃତି ପାଇଁ ସାହେ' ମାତ୍ରକ ଏକଟି ଲାଭୋତ୍ସମ୍ଭବ । ଚିମ୍ବର ଅମେକ ଦେଖ ଥେବେ ଆମେକ ଦୋଷ ଏହି ବ୍ୟାବୋଲିନୀଟି ଦେଖିବା ଆମେଲା ।

ଅଭ୍ୟାସର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ବଜ୍ରାଶ୍ରୀ । ଶାକାର ନାମ ପତାବାଦୀ । ଜନେନ୍ଦ୍ର ପତା ଯା—ବାବା ଆସିର କଷ୍ଟ କୌଣ୍ଠ ନାମ ରାଖେନ ଚନ୍ଦ୍ରପାତ୍ର । କୌଣ୍ଠର ପରିବାର ହିଁ ବକ୍ତାଙ୍କ ଐତିହାସିକ । ବ୍ୟାବୋଲିନୀ ଶାମେ ଏକମତ କୌଣ୍ଠ ବସତିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପରିବାରର ଦେଖିଲେ । ଦେଖିଲାକାର ଲୋକେମା ଦେଉ ଶାନ୍ତିକୁ ବଳେ ନାତିକ ପଢ଼ିବାର ଟିକ୍ଟା । ଚନ୍ଦ୍ରପାତ୍ର ବୈଶବବାଳ ଦେଖିଲେ ଥୁବାଇ ମେଧାବୀ ହିଲେ । କୌଣ୍ଠ କର୍ମନ୍ଦୟ ପ୍ରକି କୌଣ୍ଠ ପରିବାର ଆକାଶକୁ ହିଲି । ଥୁବ ଅର ସଥାନେଇ ତିନି ଚନ୍ଦ୍ରପାତ୍ର କାହାର ପାହିଛୁ ଅର୍କନ କରିଲା । ଅର୍କା ଚିକିତ୍ସାପାଇ ଏବଂ କରିପାରି ହିଲାଯାଇ ତିନି ପାତାଶୀ ହିଲିଲା । ପରମାର୍ଥିତେ ତିନି ଆମ ଅର୍କନ୍ତା

ଜନ୍ୟ ଚଲେ ଗେଲେନ ନାଳଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ତିନି କଠୋର ଅଧ୍ୟବସାୟଗୁଣେ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେନ । ଚନ୍ଦ୍ରଗଂଠ ଉନ୍ନତିଶ ବହୁ ବୟାସେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରହଳ କରେନ । ତଥନ ତୀର ନତୁନ ନାମ ହୟ ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜାନ । ଏକତ୍ରିଶ ବହୁ ବୟାସେ ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜାନ ସୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀପେ ଘାନ । ତୀର ସଜ୍ଜୋ ଛିଲ ଶତାର୍ଥିକ ଶିଷ୍ୟ । ସେଥାନେ ତିନି ଦୀର୍ଘ ବାର ବହୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବିଷୟେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରେନ ।

ତାରପର ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜାନ ଦେଶେ ଫିରେ ଆସେନ । ତଥନ ବାଲାଦେଶେର ରାଜ୍ଞୀ ଛିଲେନ ନୟାପାଳ । ରାଜ୍ଞାର ଅନୁରୋଧେ ତିନି ବିକ୍ରମଶୀଳ ମହାବିହାରେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷେର ପଦ ପ୍ରହଳ କରେନ । ତିନି ନାଳଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ୟ ଛିଲେନ । ତୀର ପାଭିତ୍ୟେର କଥା ଦେଶ-ବିଦେଶେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଏ ସମୟେ ତିବରତେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ନାନାରକମ ଅନାଚାର ପ୍ରବେଶ କରେ । ତିବରତେର ରାଜ୍ଞୀ ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜାନର ଅଗାଧ ପାଭିତ୍ୟେର କଥା ଶୁଣେ ତୀରକେ ତିବରତେ ଆମଜଣ ଜାନାନ । ରାଜ୍ଞାର ଧାରଣା ହିଲ, ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜାନକେ ନିଯୋଗେତେ ପାଇଲେ ସେ ଦେଶରେ ମାନ୍ୟରେ ଥକୃତ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟିବେ । ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜାନ ରାଜ୍ଞାର ଆମଜଣଗେ ପ୍ରଥମ ସାଡା ଦେନନି । କିନ୍ତୁ ପରେ ତିନି ରାଜ୍ଜି ହନ । ଆନୁମାନିକ ୧୦୪୧ ସାଲେ ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜାନ ତିବରତେର ଉଦ୍ଦେଶେ ରଖ୍ୟାନା ହନ ।



ଅତୀଶ ଦୀପଙ୍କରର ତିବରତ ଯାତ୍ରା

ମେ ସମୟ ତିବରତେ ଯାଓଯାଇ ପଥ ସୁଗମ ହିଲ ନା । ଅନେକ କଟେ ହିମାଳୟର ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତିନି ତିବରତେ ପ୍ରବେଶ କରେନ । ତିବରତ ସୀମାନ୍ତେ ଅଶେଷାରତ ରାଜ୍ୟାତିନିଧିରୀ ଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରୀଜାନକେ ବିପୁଲ ସଂବର୍ଧନା ଜାନାନ । ତିନି ତିବରତେର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଶହର, ନାନା ପ୍ରାମ ଯୁରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରେନ । ତୀର ପାଭିତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରେ ଲୋକେ ମୁଖ ହତୋ । ତିବରତେର ଲୋକେରୋ ତୀର ଧର୍ମଦେଶନା ଶୁଣେ ଆପେ ଆପେ ଫିରେ ଶେଷ ଥକୃତ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ।

বিক্রমশীলা ত্যাগ করার সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বলে গিয়েছিলেন তিবরতে তিনি মাত্র তিন বছর থাকবেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে দেশে আর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তিবরতেই থেকে গেলেন। তিবরতের মানুষকে তিনি খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিবরতিরাও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিবরতি ভাষায় বহু ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া অনেক বই সংস্কৃত থেকে তিবরতি ভাষায় অনুবাদ করেন। চিকিৎসা ও কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তিবরতের ঐথাং বিহারে তাঁকে ‘অতীশ’ উপাধি প্রদান করা হয়। ‘অতীশ’ খুব সম্মানজনক উপাধি। ১০৫৪ সালে তিবরতের ঐথাং বিহারে ৭৩ বছর বয়সে এই মহাপণ্ডিত মৃত্যুবরণ করেন। অতীশের দেহত্যন্ম সেই বিহারে অত্যন্ত র্যাদার সাথে সংরক্ষিত আছে। ১৯৭৮ সালে চিন থেকে তাঁর দেহত্যন্মের কিছু অংশ বাংলাদেশে আনা হয়। ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে এগুলো সংরক্ষিত আছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি পরিদর্শনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৭

মনীষীদের জীবনীর অনুসরণীয় দিক

কোনো মহৎ জীবনই সহজে গড়ে উঠে না। এর জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে হয়। যাঁরা একপ কীর্তিমান জীবন গঠনে সক্ষম হন, তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন। ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে থাকেন। যুগ-যুগান্তরের মানুষ তাঁদের আদর্শ ও গুণাবলি অনুশীলন করেন। মহৎ মানুষের জীবনাদর্শে আমাদের অনুসরণীয় অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই জীবনীসমূহ পাঠ করে শুধু মানসিক আনন্দ লাভ করলেই হবে না, আদর্শিক দিকগুলোও আমাদের অনুশীলন করতে হবে। আবেগে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। একাঞ্চ অনুশীলন ও অনুসরণের মাধ্যমেই একমাত্র লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। গৌতম বুদ্ধ নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণে জীবনকে সুন্দর করার জন্য অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন।

বুদ্ধের সময়ে বক্তব্য নামে একজন মুনি ছিলেন। তিনি বুদ্ধের খুবই ভক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা বুদ্ধের জ্যোতির্ময় দেহাবয়বের দিকে ভক্ষিতে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে একসময় তাঁকে ডেকে বললেন; এই ধর্মশীল দেহাবয়বের দিকে চেয়ে থেকে ফল কী? নীতি-আদর্শ অনুসরণ করো। আবেগ ত্যাগ করো। নিজের মধ্যে জ্যোতির্ময় আলোক উৎপাদনের বীজ বপন করো। নিজেকে আলোকময় করে গড়ে তোলো। বুদ্ধের এই উপদেশ লাভ করে বক্তব্য খৰ্ষি সাধনায় রত হলেন এবং অচিরেই অর্হত ফলে উন্নীত হন।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা জানা যায়। তখন বুদ্ধ উরুবিষ্ণ নগরে পরিব্রহ্মণ করছিলেন। সে সময় উরুবিষ্ণ বনে বাস করতেন তিনজন খৰ্ষি। উরুবেলাকশ্যপ, নদীকশ্যপ ও গয়াকশ্যপ তিন ভাই। তাঁরা নিজ নিজ শিষ্য নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে সেখানে বাস করতেন। তাঁরা কারো নীতি অনুসরণ করতেন না। নিজেদের ধারণা মতে গরমে ও আগুনে তপ্ত হয়ে এবং ঠাঙ্গায় পানিতে ডুবে থেকে দুঃখ মুক্তির চেষ্টা করতেন। বুদ্ধের সাথে সাক্ষাত হলে বুদ্ধ তাঁদের উপদেশ দেন।

বুদ্ধ বলেন, পানিতে ভিজে বা রোদে পুড়ে মানুষ পরিশুদ্ধ হতে পারে না। বুদ্ধ তাঁদের কাছে নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বর্ণনা করেন। তারপর বলেন, জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হলে আদর্শ ও নেতৃত্বিকতার অনুশীলন আবশ্যিক। পরে তাঁরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে মুক্তি অন্বেষণে ব্রতী হন।

সুতরাং মহৎ জীবন গঠনের জন্য মহৎ আদর্শের অনুসরণ আবশ্যিক। আমাদের জীবনকে খ্যাতিসম্পন্ন ও জ্যোতির্ময় করার জন্য আলোকিত ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীরা আদর্শের পথিকৃৎ। তাঁদের জীবনচরিত থেকে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অধ্যবসায়, সংযম ও অনুশীলনীয় নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। তাঁদের জীবনীর এই অনুসরণীয় দিকগুলো সঠিকভাবে অনুশীলন করতে পারলে সকলের জীবন সার্থক ও সফল হবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. উপালির জন্ম কপিলাবস্তুর নিম্নকুলের বৎশে।
২. বুদ্ধ উপালিকে বলে ঘোষণা করেন।
৩. রাজগৃহের প্রথম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।
৪. কৃশা গৌতমী বুবাতে সমর্থ হলেন জন্মের সাথে একই সূত্রে গাথা।
৫. এই শরীর আর আলয়।
৬. অতীশ দীপঙ্কর খ্রিষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন।
৭. অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আনন্দ থের'র দুটি উপদেশ লেখ।
২. কৃশা গৌতমীর উপদেশগুলো কী কী?
৩. অহত্প্রাণ হয়ে অভিনন্দন নন্দা কী বলেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. উপালি থের কীভাবে বিনয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন? বর্ণনা কর।
২. আনন্দ থের এর জীবন চরিত্রে আলোকে তার গুণাবলি আলোচনা করা।
৩. কৃশা গৌতমী জীবনের বাস্তবতা থেকে কী শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন আলোচনা কর।
৪. অভিনন্দন নন্দা বুবাতে পারলেন কৃষ্ণস্থায়ী, অন্তরের সৌন্দর্যই চিরস্থায়ী ব্যাখ্যা কর।
৫. পদ্ধিত অতীশ দীপঙ্করের জীবন ও কর্ম আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চন্দ্রগর্ভ কত বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন?

- | | |
|-------|-------|
| ক. ১৬ | খ. ১৯ |
| গ. ২৭ | ঘ. ২৯ |

২. উপাসি থের'র জীবনী থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়-

- i. সৎকর্ম করার প্রচেষ্টার
- ii. সূত্র আবৃত্তির প্রচেষ্টার
- iii. নির্ণোত্ত হওয়ার

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুভদ্রা তথ্যজ্ঞা রূপে, চেহারায় ও চরিত্রে অনন্য। যথাসময়ে তাঁর পছন্দ করা এক রূপবান যুবকের সাথে বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর সংসারজীবন ক্ষণস্থায়ী হয়। পরবর্তী সময়ে চিন্ত পরিবর্তন করে তিনি বিহারমুখী হন এবং ব্রহ্মচর্য পালনে সচেষ্ট হন।

৩. সুভদ্রা তথ্যজ্ঞার সাথে পাঠ্যবইয়ের কার চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

- | | |
|----------------------|----------------|
| ক. মহাপ্রজাপতি গৌতমী | খ. কৃশ্ণ গৌতমী |
| গ. অভিজ্ঞপা নন্দা | ঘ. মল্লিকা |

৪. ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে সুভদ্রা তথ্যজ্ঞা করতে পারেন-

- i. নতুন জীবন শুরু
- ii. ত্রুট্যের ক্ষয়
- iii. মনকে শান্ত ও সংযত

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. পটচারা ধনী পরিবারের মেয়ে, কিন্তু বিয়ে করেন এক গরিবের ছেলেকে। একদিন তার বাবার বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। তাই স্বামী-সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়িতে যাওয়ার পথে স্বামীকে সাপে কাটল। তখন তিনি একা দুই সন্তানকে নিয়ে রাগোনা হলেন। মাঝপথে ছোট নদী থাকায় প্রথমে তিনি ছোট শিশুটি নিয়ে নদী পার হলেন। বড় শিশুকে নেওয়ার জন্য তিনি অপর পারে আসছিলেন। কিন্তু তিনি যখন নদীর মাঝখানে, তখন বড় শিশুটি দেখল ছোট শিশুটিকে ইগল পাখি নিয়ে চলে যাচ্ছে। ইগল পাখিকে তাড়াতে চিঢ়কার করতে করতে বড় ছেলে নদীতে বাঁপ দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর পানিতে তলিয়ে গেল। স্বামী-সন্তান হারিয়ে একসময় বুদ্ধের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধের আশীর্বাদে তিনি স্বন্তি ফিরে পেলেন। পরবর্তীতে তিনি ভিক্ষুণী পথ অবলম্বন করেন।

ক. উপালি কোন বৎশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

খ. তিব্বতের রাজা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানালেন কেন?

গ. উদীপকে বর্ণিত পটচারার ঘটনায় চরিতমালার কার জীবনের ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘পটচারার অনুসৃত পথে কি নির্বাণ লাভ সম্ভব?’— পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২. ক্ষেমা তাঁর রূপ নিয়ে অহংকারী ছিলেন। তাঁর রূপের অহংকার বুদ্ধ কর্তৃক নিষিদ্ধ হবে মনে করে ক্ষেমা বুদ্ধের সম্মুখে যেতেন না। একদিন ক্ষেমা বুদ্ধের কাছে যেতে সম্ভত হলে বুদ্ধ একটি অলৌকিক দৃশ্য সৃষ্টি করেন। দৃশ্যটি হলো, স্বর্গের এক অঙ্গরা তালপাতার পাখা নিয়ে বুদ্ধকে বাতাস করছে। তখন ক্ষেমা অবাক বিঅয়ে স্বর্গের অঙ্গরাকে দেখতে লাগলেন। বুদ্ধের ইচ্ছা অনুযায়ী অঙ্গরা একসময় ঘোবন থেকে মধ্য বয়সে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তাঁকে বার্ধক্য গ্রাস করল। অঙ্গরার দাঁত নেই, চামড়া কুঁচকানো, চুল পাকা। একসময় বৃদ্ধা অঙ্গরা মাটিতে পড়ে গেল। তখন ক্ষেমা অনুভূত হয়ে বললেন, হায়! অপরূপ সৌন্দর্যের এই পরিণতি! আমার দেহেরও একদিন এ পরিণতি হবে।

ক. বুদ্ধের সেবক কে ছিলেন?

খ. পূর্ণকে আগে প্রবৃজ্যা দেওয়া হলো কেন?

গ. উদীপকে বর্ণিত কাহিনীটি চরিতমালার কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘আমার দেহেরও এ পরিণতি হবে’— চরিতমালার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜାତକ

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧେର ଅତୀତ ଜନ୍ୟେର କାହିନୀଗୁଲୋ ଜାତକ ନାମେ ପରିଚିତ । ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମବଳମ୍ବିଦେର କାହେ ଜାତକେର ଗଲ୍ଲ ଓ ଉପଦେଶଗୁଲୋର ପ୍ରଭାବ ଅପରିସୀମ । ଜାତକେର ଗଲ୍ଲେର ଶେଷେ ସେ ଉପଦେଶ ଥାକେ, ତା ଥେକେ ଆମରା ନୈତିକ ଓ ମାନବିକ ଗୁଣାବଳି ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରି । ଏହାଡ଼ା ଜାତକ ପାଠେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତେର ମାନୁମେର ଜୀବନୟାତ୍ରା, ଧର୍ମ, ସମାଜ, ଶିକ୍ଷା, ସଂକ୍ଷତି, ରାଜନୀତି, ଭୂଗୋଳ, ପରିବେଶ, ପୁରୋତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କେତେ ଜାନା ଯାଇ । ତାଇ ଜାତକ ପାଠେର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରିସୀମ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ଆମରା ଜାତକ ସମ୍ପର୍କେ ପଡ଼ିବ ।

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷେ ଆମରା—

- * ଜାତକ ସମ୍ପର୍କେ ବର୍ଣନା ଦିତେ ପାରିବ ।
- * ଜାତକ କାହିନୀ ବର୍ଣନା କରତେ ପାରିବ ।
- * ଜାତକେର ଉପଦେଶ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ ।

ପାଠ : ୧

ଜାତକ ପରିଚିତି ଓ ଜାତକେର ସଂଖ୍ୟା

ଜାତକ ଶବ୍ଦଟି ‘ଜାତ’ ଶବ୍ଦ ହତେ ଉତ୍କୃତ ହେଁବେ । ‘ଜାତ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଲୋ ଉତ୍ତମ, ଉତ୍କୃତ, ଜନ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି । ସୁତରାଂ ଜାତକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯିନି ଉତ୍ତମ ବା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେଛେ । ବୁଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟନା ଉପଳକ୍ଷେ ଶିଷ୍ୟଦେର ତାର ଅତୀତ ଜନ୍ୟେର କାହିନୀ ବର୍ଣନା କରିବାକୁ ପାଇଲା । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧେର ପୂର୍ବଜନ୍ୟେର ଏଇ କାହିନୀଗୁଲୋକେ ଜାତକ ବଲା ହେଁ । ଏକ ଜନ୍ୟେର କର୍ମଫଳେ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ହତେ ପାରେନ ନା । ବୁଦ୍ଧ ହେଁବାର ଜନ୍ୟ ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାତ୍ମରେ ପାରମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ପରିଶୁଦ୍ଧିତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପାଇଲା । ଜାତକ ପାଠେ ଜାନା ଯାଇ, ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାତ୍ମରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନାନା କୁଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତିନି ମାନବକୁଳେ ରାଜୀବ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାଣିକ, ଏବଂ ଦେବକୁଳସହ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ-ପାଖି ହେଁ ଜନ୍ମ ନିର୍ଯ୍ୟାପିତାଙ୍କୁ ପାଇଲା । ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ୟେ କୁଶଲକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପାଇଲା । ଏକ କଥାଯ ବଲା ଯାଇ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧେର ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵରୂପେ ଅତୀତ ଜନ୍ମବୃତ୍ତାତ୍ମ ଓ ଘଟନାବଳିସମୂହ ‘ଜାତକ କାହିନୀ’ ନାମେ ଥିଲା ।

ମୂଲତ ଜାତକେର ସଂଖ୍ୟା ୫୫୦ଟି । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ୫୫୦ତମ ଜନ୍ୟେ ବୋଧିଜାନ ଲାଭ କରେ ‘ବୁଦ୍ଧ’ ନାମେ ଅଭିହିତ ହେଁ । ଶ୍ରୀ ଈଶାନଚନ୍ଦ୍ର ସୌଯ ସମ୍ପାଦିତ ଜାତକ ଗ୍ରନ୍ଥେ ମୋଟ ୪୪୭ଟି ଜାତକ କାହିନୀର ଉତ୍ସ୍ଲେଖ ପାଓଯା ଯାଇ । କଥିତ ଆହେ, ୩୦ ଟି ଜାତକ କାହିନୀ କାଳେର ଗର୍ଭେ ହାରିଯେ ଗେଛେ ।

ଅନୁଶୀଳନମୂଳକ କାଜ
‘ଜାତକ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୀ?

পাঠ : ২

নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব

সৎ এবং সুন্দর পথে পরিচালিত জীবনই হলো আদর্শ জীবন। আদর্শবান ব্যক্তি সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। মৃত্যুর পরও নীতিবান এবং আদর্শবান ব্যক্তির কথা মানুষ যুগে যুগে স্মরণ করে থাকে। তাই আমাদের সকলের উচিত অনৈতিক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। কেননা নীতি-আদর্শহীন ব্যক্তি পশুর সমান। আদর্শ ও নৈতিক জীবন কীভাবে গঠন করতে হয়, তা জাতক পাঠে জানা যায়।

জাতকের গল্পগুলো হিতোপদেশমূলক। এগুলো বৃক্ষকথার গল্প নয়। ভগবান বৃন্দ ভালো কাজের সুফল এবং খারাপ কাজের কুফল বোঝানোর জন্য জাতক কাহিনীগুলো বলতেন। তাই সুন্দর মানবজীবন গঠনে জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতক কাহিনীগুলো ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলো বুবাতে সাহায্য করে। ভালো কাজে উৎসাহ যোগায়। উদার চিত্তে দান দিতে শিক্ষা দেয়। শীলবান বা চরিত্রবান, দয়াবান, নীতিবান, সত্যবাদী, ক্ষমাপ্রায়ণ, মৈত্রীপ্রায়ণ এবং পরোপকারী হতে শিক্ষা দেয়। প্রাণিহত্যা, মিথ্যা বলা, চুরি, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। কায়, বাক্য এবং মন সংয়ত করে। সম্যক জীবিকা অবলম্বন করতে উৎসাহ যোগায়। সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করতে সহায়তা করে। আত্মবোধ জাগ্রত করে। পরমতসহিষ্ণু এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন করে তোলে। বলা যায়, নৈতিক এবং আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব অপরিসীম। তাই প্রত্যেকের জাতকের শিক্ষা অনুসরণ করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

জাতকের কাহিনী থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ : ৩

কপোত জাতক

পুরাকালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদণ্ডের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব পায়রাজন্মে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বারানসির লোকেরা পুণ্য কামনায় পাখিদের সেবা করত। পাখিদের জন্য ঘরের বাইরে ও ভিতরে নানা জায়গায় ঝুড়ি ঝুলিয়ে রাখত। পায়রাজন্মী বোধিসত্ত্ব সে রকম একটি ঝুড়িতে রাতে থাকতেন। সেখান থেকে প্রতিদিন সকালে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়তেন। খাবার থেয়ে সম্ম্যার সময় সেই ঝুড়িতে এসে শয়ন করতেন।

একদিন এক কাক সেই ঘরের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় রান্নার চমৎকার গন্ধ পেল। সে উঁকি দিয়ে দেখল ভিতরে মাছ-মাংস রান্না হচ্ছে। লোভী কাক বাইরে বসে ভাবতে লাগল, কেমন করে ঐ মাছ-মাংস খাওয়া যায়। সম্ম্যার সময় পায়রাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে ভাবল, পায়রাটার সঙ্গে ভাব করেই উদ্দেশ্য সফল করতে হবে।

পরদিন ভোরে বোধিসত্ত্ব ঘৃম থেকে উঠে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। কাকও তাঁর পেছন পেছন ছুটল।
১১
১২ বোধিসত্ত্ব বললেন, “তুমি আমার সঙ্গে চললে কেন?” কাক বলল, “আপনার চালচলন আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এখন থেকে আপনার অনুচর হয়ে থাকব।”



পাচক ও সোন্তী কাক

কার্যশূর থেকে কাকটি বোধিসত্ত্বের সঙ্গে আমতে আগল। পাচক দেখল পাঞ্জাব সঙ্গে একটি কাক এসে আসছে। তাই সে কাকের জন্মাও একটি ঝুঁকি ঝুলিয়ে দিল। সেই থেকে কাকটিও সেই ঝুঁকিতে আমতে আগল। একদিন প্রেরীয় বাহিতে শহুর ঘাজ-মাল বাজা রাখিল। তা দেখে কাকের ঘূৰ সোজ হলো। সে ঠিক করল পুরাণ সে আবার ঘূৰতে বাইজে আবে না। এই ভেবে সে সামা আত অসুস্থতার জন্ম করে পড়ে রাইল। সকালে সে ঠিক করল, পাঞ্জাব সঙ্গে আবার থেকে বাইজে আবে না। বোধিসত্ত্বের মনে সমেহ হলো। তাই তিনি কাককে কলালেন, “বেশ, ঝুঁকি আলো। তবে সামাল, সোজে শচ্ছ কোলো কিছু করে বসো না।” কাককে উপস্থিত দিয়ে বোধিসত্ত্ব নিজের আবার ঝূঁকতে চলে পেলেন।

এসিকে পাচক রান্না শুরু করল। রান্নার ইঁকি থেকে বাষ দেরলোর জন্য ইঁকির মুখ একটু খোলা রাখল। একটা ইঁকির মুখ আৰারি দিয়ে ঢেকে দিল। রান্নার সুগুৰ চারিসিকে ইঁকির পক্ষল। এ সময় পাচক পানের শাম শুকালোর জন্য রান্নাক্ষেত্রে বাইজে বারাদ্দার পেল। কাক ঠিক সে সময় ঝুঁকি থেকে বেরিয়ে ইঁকির পক্ষল ঝোঁকিয়ে গিয়ে বসল। তখনই কাকারিটা দাটিকে পক্ষে বন্ধু কৃষ্ণ পর হলো। পাচক সেই শব্দ শুনে রান্নাক্ষেত্রে ছুটে এল।

এসে দেখল কাক মাংস খাওয়ার চেষ্টা করছে। পাচক সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত কাকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কাকটিকে ধরে ফেলল। এরপর সারা শরীরের পালক তুলে নিয়ে গায়ে আদা ও নুন মেঝে দিল। তারপর তাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে রাখল। যত্নগায় কাক ছটফট করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যায় ফিরে এসে কাককে দেখে সব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ভাবলেন, লোভী কাক আমার কথা না শোনায় এই ফল পেয়েছে। তারপর তিনি একটি গাথা বললেন। গাথাটির অর্থ হলো :

‘উপকারী বন্ধুর কথা স্বেচ্ছাচারীরা শোনে না। এ জন্য তার ওপর বিপদ নেমে আসে। কাক তার প্রমাণ।’

বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করে নিজে নিজে বললেন, আমি আর এখানে থাকতে পারি না। তারপর তিনি সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

কাক সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। পাচক ঝুড়িসহ কাকটি ফেলে দিল।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

কাক কেন পায়রার সাথে বন্ধুত্ব করল?

ধূর্ত কাকের পরিণতি বর্ণনা কর।

পাঠ : ৪

শশক জাতক

অতীতকালে বারানসি রাজ্যের রাজা ছিলেন ব্রহ্মদন্ত। তাঁর রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব শশককুলে জন্মগ্রহণ করে এক বনে বাস করতেন। ঐ বনের একদিকে পর্বত, একদিকে নদী এবং একদিকে গ্রাম। শশককুলী বোধিসত্ত্বের তিন বন্ধু ছিল। শিয়াল, বানর ও উদ্বিড়াল। চার বন্ধু বাস করত গজা নদীর তীরে। শশক ছিলেন খুব পণ্ডিত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি বন্ধুকে ‘দান করা উচিত’, ‘শীল রক্ষা করা উচিত’, ‘উপোসথ পালন করা উচিত’ - এরূপ ধর্মোপদেশ দিতেন। বন্ধুরা উপদেশসমূহ গ্রহণ করত। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল।

একদিন শশক চাঁদ দেখে বুঝলেন, পরদিন পূর্ণিমা। বন্ধুদের বললেন, ‘আগামীকাল পূর্ণিমা। তোমরা শীল গ্রহণ করে উপোসথ পালন কর। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দান কর। শীলবান ব্যক্তির দান মহাফলদায়ক। কোনো যাচক উপস্থিত হলে তোমরা নিজের খাবারের অংশ হতে তাকে খাবার দেবে।’

উপদেশ শুনে বন্ধুরা খাবারের খোঁজে বের হলো।

শিয়াল এক বাড়িতে ঢুকল। সে দেখল এক হাঁড়ি মাংস, মিষ্টি ও এক ভার দই বারান্দায় পড়ে আছে। সে উচ্চ স্বরে তিনবার হাঁক দিল - এগুলো কার? এগুলো কার? এগুলো কার? কেউ সাড়া দিল না। তখন সে ঐ ^৩/_২ সব দ্রব্য নিয়ে গর্তে ফিরে এল এবং ‘বেলা হলে আহার করব’ এরূপ সংকল্প করে শীলভাবনা করতে থাকল।

ଓଦିକେ ଉଦ୍‌ବିଡାଳ ସମୁଦ୍ରର ତୀରେ ଶିଯେ ମାଛର ଗଢ଼ ପେଲ । ବାଣି ଝୁଡ଼େ ମେ ଚାରାଟି ମାଛ ବେର କରଲ । ମେଣ ତିନବାର ବଲଲ- ଏଗୁଲୋ କାର ? ଏଗୁଲୋ କାର ? ଏଗୁଲୋ କାର ? କେଉଁ ସାଡା ଦିଲ ନା । ତଥିଲ ମେ ମାହଗୁଲୋ ଗର୍ଜେ ନିଯେ ଏଇ ଏବଂ ‘ବେଳା ହଲେ ଆହାର କରବ’ -ଏଇପି ସଂକଳନ କରେ ଶୀଳଭାବନା କରତେ ଥାକଲ ।

ବାନରଙ୍ଗ ବନ ଥେକେ ଏକଗୁଛ ଆମ ପେଡ଼େ ନିଯେ ଏଇ ଏବଂ ‘ବେଳା ହଲେ ଆହାର କରବ’ -ଏଇପି ସଂକଳନ କରେ ଶୀଳଭାବନା କରତେ ଥାକଲ ।



ଶଶକରନ୍ତୀ ବୈଦିସତ୍ତ୍ଵ ବଞ୍ଚିଦେର ଉପଦେଶ ଦିଚ୍ଛନ୍ଦ

ଓଦିକେ ବୈଦିସତ୍ତ୍ଵ ତୃପ୍ତ ଭକ୍ଷଣ କରବେଳ ବଲେ ମିଥିର କରଲେନ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରତେ ଲାଗଲେନ, “ଆମାର ଖାବାର ତୋ ଘାସ । ମାନୁଷ ଘାସ ଖାଇ ନା । ଆମାର କାହେ କୋନୋ ଯାଚକ ଉପସିଥିତ ହଲେ ତାକେ କୌ ଦିଯେ ଆପ୍ୟାଯନ କରବ” ।

ତାରପର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଲେନ, ନିଜେର ଶରୀରେର ମାଂସ ଆଗୁନେ ପୁଡ଼ିଯେ ତା ଦିଯେ ଆପ୍ୟାଯନ କରବେଳ ।

ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଶଶକେର ମହାସଂକଳନେ କଥା ଜାନତେ ପାରଲେନ । ଦାନ ପରୀକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକ ତ୍ରାକ୍ଷାପେର ବେଶେ ଦେଖାନେ ଉପସିଥିତ ହଲେନ । ତିନି ଏକେ ଏକେ ସବାର ଦାନ ଅହପ କରଲେନ । ଅବଶେଷେ ଶଶକେର କାହେ ଏଲେନ । ଶଶକ ତାକେ ଦେଖେ ଖୁବ ଖୁଶି । ତ୍ରାକ୍ଷାପରନ୍ତୀ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ବଲଲେନ, ‘ଆପନି ଆହାରେର ଜନ୍ୟ ଆମାର କାହେ ଏଦେ ଉତ୍ସମ କାଜ କରାହେଲ । ଆମି ଆପନାକେ ଏମନ ଦାନ ଦେବ, ଯା ଆଗେ କେଉଁ କଥନେ ଦାନ କରେନି । ଆପନି ଆଗୁନ ଜ୍ଵାଲନ । ଆମି ତାତେ ବୌପ ଦେବ । ଆଗୁନେ ଆମାର ଶରୀର ସିଙ୍ଗ ହଲେ ଆପନି ମେହି ମାଂସ ଖେଲେ ଆମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଲନ

করবেন।' ইন্দ্র খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালালেন। শশকরূপী বোধিসত্ত্ব তিনবার গা ঝাড়া দিলেন। পোকা-মাকড় থাকলে যাতে শরীর থেকে পড়ে যায়। তারপর নির্ভয়ে আগুনে বাঁপ দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য আগুন তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করল না। শশক ব্রাহ্মণকে বললেন, ব্রাহ্মণ! তোমার আগুন এত শীতল কেন?

ইন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে শশক! আমি ইন্দ্র। তোমার দান পরীক্ষার জন্য এরূপ করেছি।

শশক বললেন, হে দেবরাজ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাই আমার দান পরীক্ষা করুক। আমাকে কখনো দানবিমুখ দেখবে না।

ইন্দ্র বললেন, 'শশক, তোমার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক।' দেবরাজ ইন্দ্র চন্দ্রমহলে একটি শশকচিহ্ন ঢাঁকে দিলেন। সে কারণে আজও আমরা চাঁদে একটি শশকের চিহ্ন দেখি।

উপদেশ : শীলবান ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ
শশকের বন্ধু কারা?

পাঠ : ৫

আন্তর্জাতিক

পুরাকালে বারানসি রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তার রাজত্বকালে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। বয়োঃপ্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্ব খুবি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি পাঁচশত বিক্ষু সংগে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে বাস করতেন।

একবার হিমালয়ে ভয়ানক অনাবৃষ্টি দেখা দিল। সব জলাশয় শুকিয়ে গেল। চারদিকে পানীয় জলের বড় অভাব। তৃষ্ণায় পশুপাখি সব কাতর হয়ে পড়ল। কোথাও এক ফেঁটা জল নেই। পশুপাখিদের এই যন্ত্রণা দেখে এক ভিক্ষুর মায়া হল।

ভিক্ষু একটা গাছ কাটলেন। সেই গাছের ডাল দিয়ে একটা ডোঙা তৈরি করলেন। ডোঙাটি জলপূর্ণ করে তিনি পশুপাখিদের জলপানের ব্যবস্থা করে দিলেন। বনের সব পশুপাখি এসে সেই ডোঙা থেকে জলপান করতে লাগল। এতে অসংখ্য জীবের প্রাণ রক্ষা গেল।

প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী জলপান করতে আসতে লাগল। ফলে ভিক্ষু আহারের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করার সময় পেতেন না। ভিক্ষু তার নিজের আহারের কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত প্রাণীদের তৃষ্ণা মেটাতে লাগলেন। এটা দেখে পশুপাখিরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের তৃষ্ণা মেটানোর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ভিক্ষু অনাহারে থেকে কষ্ট ভোগ করছেন। তারা ঠিক করল, এবার থেকে যে প্রাণী যখন জলপান করতে আসবে, তখন তার সাধ্য অনুসারে ভিক্ষুর জন্য কিছু ফল নিয়ে আসবে।



প্রাণীরা জলপান করছে

এরপর থেকে প্রত্যেক পশুপাখি নিজের সাধ্যমতো আম, জাম, কাঠাল, মধুর, অমধুর প্রভৃতি ফল নিয়ে জলপান করতে আসতে লাগল। এভাবে প্রতিদিন এত ফল আসতে লাগল যে, আশ্রমের পাঁচশ তিক্তও খেয়ে শেষ করতে পারতেন না।

সৎ কাজে ভিক্ষুটির এই আত্মোৎসর্গ দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'দেখ, সৎকাজের কী অঙ্গুত মহিমা! একজনের ব্রতের ফল কতজন ভিক্ষু ভোগ করছে। তাদের কাউকে আর ফল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কষ্ট করে বলে যেতে হচ্ছে না।'

উত্তর : কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলেরই উদ্যয়শীল হওয়া উচিত।

অনুষ্ঠানযুক্ত কাজ
ভিক্ষু কেন প্রাণীদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করেছিলেন?

পাঠ : ৬

মশক জাতক

পুরাকালে বারনসিরাজ ব্রহ্মাদণ্ডের সময়ে বোধিসত্ত্ব বাণিজ্য করে জীবন ধারণ করতেন। তখন কাশী রাজ্যের এক হামে অনেক সূত্রধর বাস করত। তারা কাঠ দিয়ে নানারকম আসবাবপত্র তৈরি করত। সেখানে একদিন এক বৃক্ষ সূত্রধর কাঠ কেটে আসবাবপত্র তৈরির কাজ করছিল। পাশে তার পুত্র বসে ছিল। এমন সময় এক মশক তার মাথায় বসে সুঁচালো ঝুল ঝুটিয়ে দিল। সে পুত্রকে ডেকে বলল, 'বড়স, আমার মাথার

ମଶକ ହୁଲ କୁଟିଆଁ ରଙ୍ଗ ପାଇ କରାଛେ । ଫୁଲି ମଶକଟି ଭାଡ଼ିଆଁ ଦାଓ ।' ପୂଜ୍ନ ବଳଳ, 'ଆବା, ଆପଣି ଶିଖିର ଥାବୁଳ । ଆମି ଏକ ଆଘାତେଇ ମଶକଟି ମେରେ କେଲବ ।' ଏ ସମୟ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ପଣ୍ୟସନ୍ଧାର ନିଯମେ ବୃଦ୍ଧ ସୁଅଧରେର ବାଡ଼ିର ସାଥିରେ ଏସେ ହାଜିର ହଲେନ । ତିନି ବାଡ଼ିର ସାଥିରେ ବସଲେନ । ତିନି ବସଲେ ସୁଅଧର ଆବାର ବଳଳ, 'ବନ୍ଦସ, ମଶକଟି ଭାଡ଼ିଆଁ ଦାଓ ।' ତଥିନ ଭାବ ଛେଲେ 'ଭାଡ଼ାଛି' ବଲେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ଡିକ୍ରିପ୍ଶାର କୁଠାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଲ ଏବଂ ପିତାର ପେଛି ଦିକ ଥେବେ 'ମଶା ମାରି', 'ମଶା ମାରି' ବଲାତେ ବୁଦ୍ଧର ମାଧ୍ୟମ ଜୋରେ ଆଘାତ କରିଲ । ସାଥେ ସାଥେ ବୁଦ୍ଧର



ବୁଦ୍ଧ ଓ ମୂର୍ଖ ଛେଲେର କାଣ୍ଡ

ମାର୍ଗ କେଟେ ରଙ୍ଗ ବେର ହତେ ଲାଗଲ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁମୁଖେ ପତିତ ହଲୋ । ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ଏହି କାଣ୍ଡ ଦେଖେ ହତବାକ ହେଁ ଗେଲେନ । ତିନି ଭାବଲେନ, ଏତ ନିର୍ବୀଧ ଲୋକ କୋଥାଓ ଦେଉନି । ଏକଥିମ୍ବ ମୂର୍ଖର ଚେଯେ ପତିତ ଶତ୍ରୁଓ ଅନେକ ଭାଲୋ । କାରଣ ଯିନି ବୁଦ୍ଧିଯାନ ତିନି ଶାନ୍ତିର ତରେ ମାନୁଷ ହତ୍ୟା ଥେବେ ବିରତ ଥାକେନ । କିମ୍ବ ଛେଲେଟି ଏହି ମୂର୍ଖ ମେ ମଶା ମାରିତେ ଶିରେ ନିଜେର ବାବାକେ ମେରେ କେଲାଲ ।

ମୂର୍ଖ ଛେଲେର ଏହି କାଣ୍ଡ ଦେଖେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ଏକଟି ଗାଥା ଆବୁଦ୍ଧି କରେ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରଲେନ । ଗାଥାଟି ହଲୋ :

ବୁଦ୍ଧିଯାନ ଶତ୍ରୁ ସେଇ ଯୋଗ ଭାଲୋ
ନିର୍ବୀଧ ଯିତ୍ରେ କୀ କାଣ୍ଡ?
ମଶକ ମାରିତେ ବସିଲ ପିତାରେ
ମହାମୂର୍ଖ ପୂଜ୍ନ ଆଜି ।

উপদেশ : মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বৃদ্ধিমান শত্রু ভালো।

অনুশীলনযুক্ত কাজ
সূত্রধর কী কাজ করছিল?

পাঠ : ৭

জাতকের উপদেশসমূহ অনুসরণের সুফল

‘জাতক’ হলো গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। কিন্তু জাতকগুলোতে অনুসরণীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ পাওয়া যায়। এসব উপদেশ মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির উৎকর্ষসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এসব উপদেশ অনুসরণ করা একান্ত উচিত। নিচে জাতকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনুসরণীয় উপদেশ তুলে ধরা হলো। যেমন : কপোত জাতক পাঠে আমরা লোভের পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারি। এ শিক্ষামতে, অতিরিক্ত লোভ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। তাই সকলের লোভ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এভাবে শশক জাতকে শীল পালনের উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারি। এ জাতকের উপদেশ মতে, শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন। আম্রজাতক কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্যমশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। মশক ও রোহিনী জাতকে মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বৃদ্ধিমান শত্রু ভালো বলে নির্দেশনা রয়েছে।

জাতকগুলোতে এরূপ অনেক উপদেশ পাওয়া যায়, যা নির্বুদ্ধিতা, কৃপণতা, অলসতা, অহংবোধ, ধূর্ততা, ইত্যাদি বর্জনের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া এসব উপদেশ আমাদেরকে অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে কুশলকর্ম সম্পাদনের প্রেরণা যোগায়। নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ করে। হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রীপরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। তাই শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে জাতকের উপদেশ অনুসরণ অপরিহার্য।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. এক জন্মের কেউ বুদ্ধ হতে পারে না।
২. যত্নগায় কাক করতে লাগল।
৩. একদিন শশক দেখে বুঝাল পরদিন পূর্ণিমা।
৪. একবার হিমালয়ে ভয়ানক দেখা দিল।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বোধিসত্ত্ব প্রতিটি জন্মে	মাছের গম্বুজ পেল।
২. জাতকের কাহিনীগুলো	ধূর্ত কাকের উদ্দেশ্য বুঝাতে পারল।
৩. বারানসির লোকেরা পুণ্য কামনায়	কুশলকর্ম সম্পাদন করতেন।
৪. পাচক সঙ্গে সঙ্গে	ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলো বুঝাতে সাহায্য করে।
৫. উদ্বিড়াল সমুদ্রের তীরে গিয়ে	পাখিদের সেবা করতেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জাতকের সংখ্যা কত?
 ২. ভিক্ষু কীভাবে প্রাণীদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করলেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
 ৩. শশক তাঁর বন্ধুদের কী ধর্মীয়পদেশ দিতেন?
 ৪. মশকটি বৃন্দের মাথায় কী করছিল?

ବର୍ଣନାମୂଲକ ପତ୍ର

১. ‘জাতক’ কাকে বলে? জাতকের পরিচিতি বিস্তারিত আলোচনা কর।
 ২. আত্ম জাতকের উপদেশ নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।
 ৩. মুর্খ বন্ধুর চেয়ে বৃদ্ধিমান শত্রু কেন ভালো? ব্যাখ্যা কর।

ବ୍ୟାକନିର୍ଣ୍ଣାଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ର

- ### ১. পায়রাক্ষপী বোধিসত্ত্বের অনুচর হিসেবে কে থাকত?

ক. মশক

୪୮

গ. বানর

ঘ. শশীক

২. উপকারী বন্ধুর কথা স্মেচ্ছাচারীরা না শুনলে-

- i. বিপদ অবশ্যস্থাবী হয়
 - ii. মৃত্যু অনিবার্য হয়
 - iii. সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

১

ખ. i ઓ ii

గ. ii و iii

ঘ. i, ii ও iii

ନିଚେର ଅନକ୍ଷେତ୍ରଟି ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ତ ଓ ୪ ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ତୁମ ଚାକମା ପେଶାଯ ରାଜମିତ୍ରୀ । କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚତୁର । ତାର ଛେଲେ ବିମଳ ଚାକମା ଏକେବାରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋକା । ଏ କାବଣେ ମାରେ ଘରେ ମାରାତକ ସମସ୍ଯା ହୁଁ ।

- ### ৩. তরুণ চাকমাৰ চৱিত্ৰেৰ সাথে কোন জাতকেৰ মিল বল্যেছে?

ক কপোত জাতক

খ আম জাতক

গ মশক জাতক

ঘৃতক শশক

৪. বিমলের আচরণে কোন দিকটি প্রকাশ পায়?

ক. নির্বোধের

খ. সরলতার

গ. অজ্ঞতার

ঘ. হেঁয়ালিগনার

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একদা মহেশখালীর নিচু জায়গায় অতিবৃষ্টির কারণে নলকূপগুলো ডুবে যায়। এতে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। উক্ত এলাকায় দুরবস্থার খবর পত্রিকায় দেখে মানিক বড়ুয়ার মায়া হয়। তাই তিনি তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এতে এলাকাবাসী উপকৃত হয়।

ক. চার বন্ধু কোথায় বাস করত?

খ. অনৈতিক কাজ করা উচিত নয় কেন?

গ. মানিক বড়ুয়ার সাথে জাতকের কার চরিত্রের মিল পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া উচিত’ – এ উপদেশটির সঙ্গে মানিক বড়ুয়ার কাজটি কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

২. এক বুড়িমার নাতির পুতুল কেনার শখ হলো। তাই সে ঠাকুরমার কাছে বায়না ধরে। কিন্তু বুড়িমা সম্বলহীন হওয়ায় নাতির ইচ্ছা পূরণে বাসার পুরনো এক থালা বদল করে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে পুতুল কিনতে চায়। ফেরিওয়ালা থালাটি সোনার বুরতে পেরে ছলনা করে থালার মূল্য অনেক কম বলে পুতুল দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু বুড়ি অন্য এক ফেরিওয়ালার নিকট বেশি দামে থালাটি বিক্রয় করে পুতুল কিনে। পরে প্রথম ফেরিওয়ালা এসে তা শুনে হায় হায় করতে করতে মৃত্যুবরণ করল।

ক. জাতক শব্দের অর্থ কী?

খ. জাতক পাঠের পুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত গল্পটি কোন জাতকের সাথে সাদৃশ্য? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. লোভী ফেরিওয়ালার আচরণের ফলাফল তোমার পাঠ্যবইয়ের জাতকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবের। কালের পরিক্রমায় এগুলো ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। খনন কার্যের ফলে এসব ধ্বংস স্তূপ থেকে প্রাচীন অনেক মূল্যবান নির্দশন ও প্রত্নসামগ্রি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ রাজন্যবর্ষের অনেক কীর্তি জড়িত আছে। বাংলাদেশ সরকার এসব ধ্বংসস্তূপ ও আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করছে। এছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক অপূর্ব সুন্দর বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধমূর্তি ও চৈত্য আছে। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক লোক এগুলো দেখতে আসে। তাই এগুলো বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে খ্যাত। এগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস। এসব স্থান বৌদ্ধদের নিকট খুবই পবিত্র এবং প্রিয়। এগুলো দর্শন করলে মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা দিতে পারব।
- * বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান পরিচিতি

বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান আছে। এগুলোর মধ্যে বিহার, চৈত্য, বুদ্ধ, বৌদ্ধিসম্মতি ও দেব-দেবীর মূর্তি, স্তৃপ, প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও নগরের ধ্বংসাবশেষ, ব্যবহার্য দ্রব্য, পোড়ামাটির ফলক, চিত্র, মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসবের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

খননকার্যের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লার ময়নামতিতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহার ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে শালবন মহাবিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, বুদ্ধবান বিহার, ইটাখোলা বিহার, কৃটিল্য মুড়া, কোটবাড়ি মুড়া, চারপত্র মুড়া, ত্রিভুবনমুড়া উল্লেখযোগ্য। বগড়া জেলায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মহাস্থানগড়, ভাসু বিহার, গোকীদ ভিটা, বৈরাগীর ভিটা অন্যতম। নওগাঁ জেলার পাহাড়গুরে সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের আবিষ্কৃত সর্ববৃহৎ প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। এছাড়া এ অঞ্চলে হলুদ বিহার, জগন্মল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে। দিনাজপুরে সীতাকোট বিহারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সম্প্রতি নরসিংহী জেলায় উয়ারী বটেশ্বর, পঞ্চগড়ে পদ্মবিহার, এবং মুক্তিগঞ্জ জেলার রঘুনাথপুরে বিক্রমপুরী বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো আমাদের অতীত ঐতিহ্যের আরক। বাংলাদেশ সরকার এগুলো গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ করছে। এসব বৌদ্ধ ঐতিহ্য দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক পর্যটকের সমাগম হয়।

আধুনিককালে নির্মিত অপূর্ব সুন্দর বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধমূর্তি আছে, যেগুলো বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে পাহাড়তলীর মহামুনি বিহার, রাউজানের সুর্দশন বিহার, বাগোয়ানের ফরাচিন বিহার, পটিয়ার সেবাসদন বিহার, ঠেঁগুরপুনির বুড়া গোসাই বিহার, চক্রশালা বিহার, রামুর রামকোট বিহার, কক্ষবাজারের অগ্রগমেধা বিহার, রাঙামাটির চিত্মরম বিহার, রাজবন বিহার, সীতাকুণ্ডের সজ্জারাম বিহার, খাগড়াছড়ির পানছড়িতে অবস্থিত অরণ্য কুটির বিহার, ঢাকার ১০^০ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবানের স্বর্ণ মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এসব বিহারে স্থাপিত বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য

স্থাপনার নির্মাণশৈলী খুবই চমৎকার। বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী বিহারের দেয়ালে অঙ্কিত আছে যা আকর্ষণীয় এবং দর্শনার্থীর মনে ধর্মভাব জাগ্রত করে। দেড় শত বছর আগে ঠেঁগরপুনি গ্রামের পুকুরে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, স্বর্ণমুদ্রার পাত্রসহ মূর্তিটি পুকুর থেকে উদ্ধার করার জন্য হারাধন বড়ুয়ার স্ত্রী নীলমণি বড়ুয়া স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হন। তাঁর স্বপ্নের বিবরণ অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রার পাত্রসহ মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। মূর্তিটি অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে জানা যায়। এই মূর্তির নিকট যদি কেউ কুশলচিত্তে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তার সেই মনোবাসনা পূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে চিত্তমরমের বুদ্ধমূর্তি, মহামুনি বুদ্ধমূর্তি, বাগোয়ানের ফরাচিন মূর্তি ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে। তাই অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ যে কোনো শুভকাজ আরম্ভ করার আগে এসব বিহারে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিহারগুলো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। এসব বিহার প্রাঙ্গণে বিভিন্ন পূর্ণিমা তিথিতে মেলা ও উৎসবের আয়োজন হয়। জাতি-ধর্মনিরিষেষে এসব স্থানে বহু পর্যটকের সমাগম হয়। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক বৌদ্ধ বিহার, চৈত্য ও বুদ্ধমূর্তি আছে। এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর।

অনুশীলনমূলক কাজ

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসমূহের তালিকা তৈরি কর (দলীয় কাজ)।
আধুনিক কালের দশটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারের নাম লেখ।

পাঠ : ২

ময়নামতি

কুমিল্লা জেলার কেন্দ্রস্থল থেকে আট মাইল দূরে ময়নামতি অবস্থিত। ময়নামতি ছোট ছোট পাহাড়ে ধেরা এবং প্রায় এগুর মাইল বিস্তৃত। এই পাহাড়গুলো অতীতে বৌদ্ধ বিহার, স্তুপ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল। খননকার্যের ফলে এখানে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও স্তুপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে এ সকল নির্দশন আবিষ্কৃত হয়। সে সময় এগুলো ঢিবি আকারে ছিল। স্থানীয় লোকেরা এসব ঢিবি থেকে ইট সঞ্চহ করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কুমিল্লা বিমানবন্দর তৈরির সময় ঠিকাদাররাও এসব ঢিবি থেকে ইট সঞ্চহ করত। ফলে অনেক মূল্যবান প্রত্নবস্তু নষ্ট ও হারিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সরকার ২০টি নির্দশনকে প্রাচীন কীর্তি রক্ষা আইনে সংরক্ষিত করেছে। তার মধ্যে ময়নামতি অন্যতম। এখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে খননকাজ চালানো হয়। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, স্তুপ, বুদ্ধমূর্তি, স্থর্ণ ও তাম্র মূদ্রা, মৃৎফলক, আসবাবপত্র এবং শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, এখানে পালবৎশ, খড়গবৎশ, চন্দ্রবৎশ, দেববৎশ প্রভৃতি বৎশের বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বৌদ্ধ রাজবৎশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়নামতি অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ বিহার চৈত্য স্তুপ প্রভৃতি নির্মিত হয়। দ্বিতীয় সঙ্গম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ময়নামতি ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধ বিহারগুলো বিদ্যাচার্চার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে বিদেশ থেকে প্রতিতরো বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করতে আসতেন।

শালবন মহাবিহার

কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ বিহার হল শালবন মহাবিহার। খনন কার্যের ফলে শালবন মহা বিহারের ধ্বংসস্তুপে একটি তাত্ত্বিলিপি পাওয়া যায়। সেই তাত্ত্বিলিপি হতে জানা যায় যে, শালবন মহাবিহারটি রাজা ভবদেব নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দেববৎশের রাজা আনন্দদেবের পুত্র। অষ্টম শতাব্দীর দিকে দেববৎশ এ অঞ্চল শাসন করতেন। উক্ত বিহারের ধ্বংসাবশেষ হতে বোৰা যায়, বিহারটি ছিল বর্ণকৃতির। প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট। বিহারের চারদিক দেয়ালবেষ্টিত। দেয়ালের উচ্চতা সাড়ে ১৬ ফুট।



শালবন মহাবিহার

এই বিহারে ১১৫টি কক্ষ ছিল। সব কক্ষই সমান। কক্ষগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস করতেন। একটি কক্ষ থেকে অপর কক্ষ ৫ ফুট পুরু দেয়াল দিয়ে পৃথক করা। উভয় দিকে একটি মাত্র প্রবেশপথ ছিল। বিহারে প্রবেশের সিঁড়িও উভয় দিকে ছিল। মূল বিহারটি ক্রুশ আকৃতির। এটি ইট নির্মিত এবং বিহার অঞ্জনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটি আয়তাকার। দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট, অন্ত্যে ১১০ ফুট। বিহারকে বেষ্টন করে ৭ ফুট চওড়া প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। বিহার গাত্রের দেয়াল সারি সারি পোড়ামাটির ফলক চিত্রে অলঙ্কৃত ছিল।

বিহারাঙ্গনে আরো অনেক স্থাপত্যের নির্দর্শন আছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্তুতিবিশিষ্ট একটি হলঘর আছে। কেন্দ্রীয় বিহারের পশ্চিমে দুটি ছোট মন্দির আছে। বিহারের বাইরে উভয়-পশ্চিম কোণ থেকে ৬০ ফুট দূরে বর্গাকৃতির একটি চার কোণাকার বিহার আছে। পূজাকক্ষ বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

খননের ফলে এখানে বহু প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ৮টি তাত্ত্বিকি, স্বর্ণ, রৌপ্য মূদ্রা, অলংকার, ব্রাজের বুর্ধ, ও বোধিসত্ত্বমূর্তি, নানা দেব-দেবীর মূর্তি, অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, অলঙ্কৃত ইট, প্রস্তরমূর্তি, তামার পাত্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসপত্র উল্লেখযোগ্য। মৃত্তিগুলো খুবই সুন্দর এবং মূল্যবান।

শালবন মহাবিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম চর্চার প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এই বিহারে শিক্ষা দেওয়া হতো। বিদ্যাপীঠ হিসেবে এ বিহারের খুব সুস্থানি ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিভারা এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতেন। দেববৎশ, চন্দ্রবৎশ এবং পালবৎশের রাজাগাঁও এই বিহারের পৃষ্ঠাগোষকতা করেন। বিহারটি চার শত বছর টিকে ছিল।

অনুশীলনযুদ্ধক কাজ

ময়নামতি কোথায় অবস্থিত?

ময়নামতিতে কখন বৌদ্ধ নির্দর্শনগুলো আবিকৃত হয়েছিল?

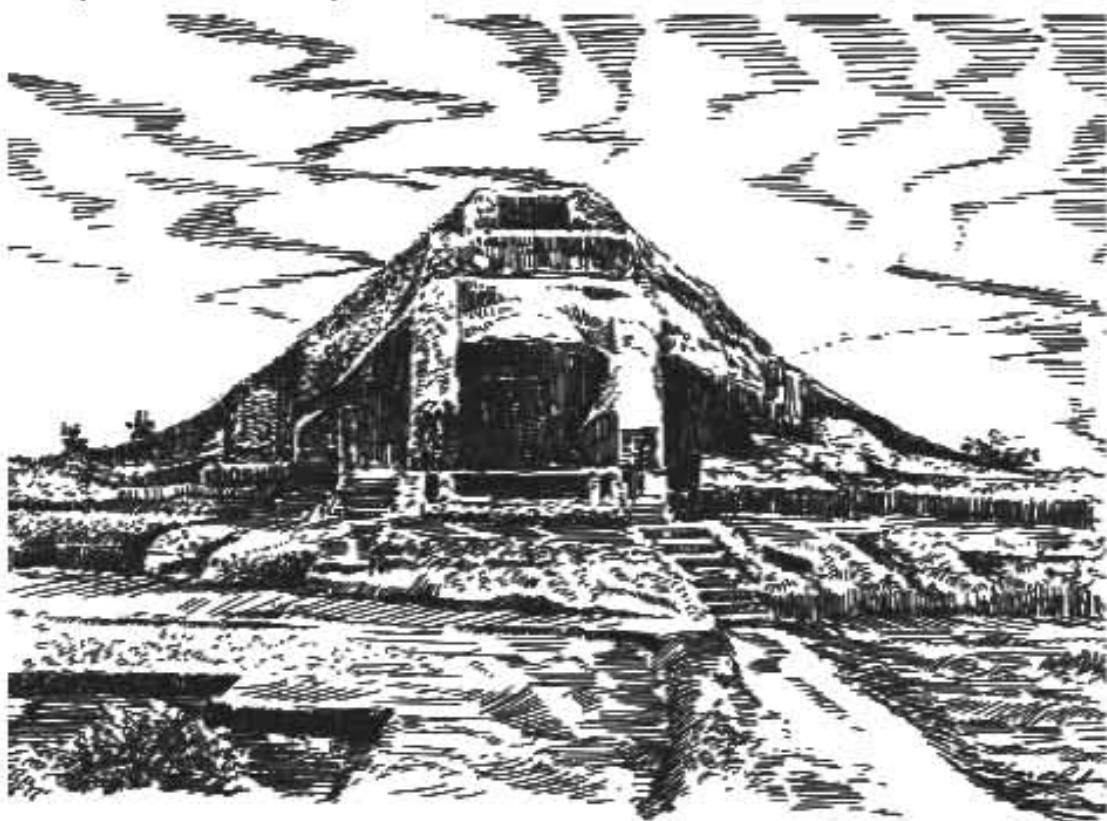
শালবন মহাবিহারে যেসব জিনিস আবিকৃত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

শালবন মহাবিহারের একটি চিত্র অঙ্কন কর।

পাঠ : ৩

সোমপুর

নগরী জেলার আয়োগী গ্রেডেটেশন থেকে প্রায় তার কিলোমিটার দূরে পাহাড়পুর অবস্থিত। পাহাড়পুরের বাইরে এই অকল্পিত শাসন করতেন। এ অকল্পিত বৌদ্ধ সভ্যতার প্রধানক্ষেত্র হিল। পাহাড়পুরের আজ ধর্মস্থান এখানে একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করেন। বিহারটির নাম 'সোমপুর মহাবিহার'। এটি হিল মহিশ-পূর্ব পশ্চিমার বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারের অন্য পাহাড়পুরের খাতি চারপিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিচে সোমপুর মহাবিহারের পরিচর ফুলে ধূমা ঘোলা।



সোমপুর মহাবিহার

সোমপুর মহাবিহার

খননকার্যের কলে সোমপুর মহাবিহারের খননোবশের আবিষ্কৃত হয়। বিহারটি বর্গাকৃতির। আয় ২৭ একর জমি ক্ষেত্রে বিহারটি অক্ষিত্বিত হিল। এই বিহারের আয়োজন উচ্চতা-সূচিতে ৯২২ মুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১১৯ মুট। বিহারের ঢাকাক্ষিক হকাও ইটের দেখাল দিয়ে দেখো। বিশাল বিহারটি সূর্যের মতো দেখায়। একে ডিম্বসূর বসবাসের জন্য ১৭৫টি কক্ষ হিল। কক্ষগুলোতে কোনো জীবাশ্ম হিল না। তবে দেখালের মধ্যে কূলুটি হিল। সব কটি কক্ষ একই মাপের (18×15 মুট)। একেক কক্ষ একটি অবেশণীয় রয়েছে। বিহারালয়ে অসংখ্য শিবেদন রূপ, হেট হেট শিবির, পুকুরগী এবং অস্ত্রালয় স্থাপনা রয়েছে। বিহারের কেন্দ্রস্থলে রূপ আকৃতির সুটিক একটি শিল্প আছে। অঙ্গভাবিক ধনসের কলে এর ধনলোকশের তিহিক রয়েছে।

বিহারের অধীন অবেশগত উভয় পিকে অবস্থিত। অবেশগত হিল বেশ বিদ্যুৎ। বিহারের সেবানগাম অগুর্ম পোড়ামাটির কলক টিকে অলঙ্কৃত ছিল। সহজ-সরল আধীশ শিখীরা মাটি দিয়ে এগুলো তৈরি করেছিল। এগুলো হিল টাচান বালোর সমাজ ট্রি। এগুলোর শিখানান অনল্য সাধারণ।

রাজা ধৰ্মলাল এ বিহারকে ফেজ্জ করে আরও গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ বিহার ও শিকাকেজ্জ অতিথী করেছিলেন বলে জানা যায়। এই বিহারের ধৰ্মসাধনের থেকে খননকার্যের কলে বহু বৃক্ষ, বোমিসহ ও বিভিন্ন সেবদেৰীর সৃষ্টি, সুস্থা, শিলালিপি, তাৰ্য পৰিষ্ঠিত মৃহ্য, আসবাবপত্ৰ আবিহৃত হৈ।

অহুপত্তি বোধিজ্ঞ ও অজীশ সীপজুত্ত এ বিহারে অবস্থান কৰেন। পঞ্জে অজীশ সীপজুত্ত ডিবতে পিয়ে হৰ্ম ধৰ্ম ধৰ্ম এবং বহু বৈশ্ব রচনা কৰেন। এটি সুন্ম বৌদ্ধ বিহারই হিল না, বিদাশীত ও হিল। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জান-বিজ্ঞানের নানা বিহু শিক্ষা দেখোৱা হতো। দেশ-বিদেশি পৰিষ্কৃত এই বিহারে বিদ্যাশিকার জন্য আসতেন। বাহিরিদেশ এ বিহারের সুখ্যাতি হাতিয়ে পড়েছিল। ইউনেস্কো পারাম্পৰার সোমপুর অহুবিহারকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে বীৰ্মুণ্ডি দান কৰেছে।

অসমীয়ামূলক বাজ

সোমপুর অহুবিহার অভাসে অবস্থিত হাতিয়ামুলোৱা ভালিকা তৈরি কৰ (মৌৰ বাজ)।

সোমপুর অহুবিহারে পাঞ্চ প্রবেশ ভালিকা কৰ্তৃত কৰ।

পাঠ : ৪

রামকোট বিহার

কল্পবঙ্গের জেলার রাম উপজেলায় রামকোট বিহার অবস্থিত। চৌধুরী-কল্পবঙ্গের ধৰ্ম সংকলনে থাক মু' মাইল পূর্বে আকৃতিক ঘনোরম পরিবেশে হেট হেট পাহাড়ে বেৱা বিহারটি সেখতে খুবই সুন্দৰ। বিহারের কটকে 'রামকুট বনান্ন বৌদ্ধ বিহার' লেখা আয়োজন। কলে স্থানীয়ভাবে এটিকে সবাই রামকোট বনান্ন নামেই জানে। পাঞ্চ প্রবেশক ও বিভিন্ন ইতিহাসবিদশশের মতে, এ বিহার সন্ন্যাটি অশোকের স্থায়ে বা তার পৰবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত।



রামকোট বিহারের অবেশগত

সতেরটি ছোট বড় পাহাড় দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বিহারটি পরিবেষ্টিত। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে চারদিকে ছড়ানো বহু প্রাচীন ইটের টুকরো, বৃদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ, পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। বিহারটির চূড়ার উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। এই অসাধারণ নির্মাণ কাজের জন্য বিহারটি অন্যতম বৌদ্ধ নির্দেশন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। রামকোট বিহারের দক্ষিণ পাশের অন্য একটি ছোট পাহাড়ের স্তুপ থেকে একটি মূল্যবান শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। সেটি ডাকাতদল লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। স্থানীয় জনসাধারণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই মূল্যবান শিলালিপিটি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। স্তুপটিও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। জানা যায়, ১৯৩০ সালে জগৎসন্দু মহাথের নামে মিয়ানমারের (আগের বার্মা) এক ভিক্ষু শ্রীলংকায় একখানি শিলালিপি উদ্ধার করেন। সেই শিলালিপির বর্ণনা মতে এখানে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালানো হয়। খননকাজের ফলে বৃহৎ সজ্ঞারামটির ধ্বংসাবশেষ ও পাথরে নির্মিত সুদৃশ্য বৃহদাকার অভয়মুদ্রার একটি বৃদ্ধ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন এ বৃদ্ধমূর্তিটি এখনও রামকোট বিহারে সংরক্ষিত আছে। বিহারের চারপাশে প্রচুর পরিমাণ স্থানীয় বেলে পাথরে নির্মিত ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে বুদ্ধের দুটি পদচিহ্ন (পূর্ণাকার) ও ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বৃদ্ধমূর্তিটি অন্যতম।

বিহারটির দক্ষিণ-পূর্বদিকে সবচেয়ে মূল্যবান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। এ প্রত্নস্থলের কেন্দ্রস্থলটি আনুমানিক ৩০ ফুট উঁচু একটি টিলার ওপর অবস্থিত। গঠন প্রণালি বিবেচনা করে এটি একটি বিশাল সজ্ঞারাম ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই বিহারটি চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকান রাজ্যের সম্পর্ক ও সংস্কৃতি বিনিময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

বর্তমানে বিহারটিতে ‘অরিয়ধর্ম’ নামে একটি পাঠ্যাগার আছে। গ্রন্থসংখ্যা ছয়শতের অধিক। পাঠ্যাগারটি সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত।

এ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ একটি রম্যবতী নগরী ও বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যময় গৌরব গাথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্থানীয় ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ বিহারস্থ ভিক্ষু ও শ্রমণদের ব্যয়ভার সানন্দে বহন করেন। বিহারে অবস্থিত বৃহৎ বৃদ্ধমূর্তিটি দর্শন করার জন্য দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক এখানে আসেন। খননকার্য চালানো হলে এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্বন্তু আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ
রামকোট বিহার কোথায় অবস্থিত?
রামকোট বিহারের গঠনশৈলী বর্ণনা কর।

পাঠ : ৫

রাজবন বিহার

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা শহরের একটি প্রসিদ্ধ বিহার হলো রাজবন বিহার। এটি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহারটি অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। বিহারের মনোরম এলাকায় পশুপাথি নির্ভয়ে বিচরণ ও চলাচল করে। শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। গভীর অরণ্যে ভাবনা করায় তিনি “বনভন্তে” নামেই অধিক পরিচিত। বাংলাদেশি বৌদ্ধরা তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। বাংলাদেশি বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে তাঁর অনন্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি চাকমা রাজপরিবার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে ১৯৭৪ সালে রাঙামাটি জেলার লংগদু থেকে এ বিহারে আগমন করেন। রাজপরিবার কর্তৃক দানকৃত জমিসহ রাজবন বিহারের মোট আয়তন ৪৭ একর। বিহারে উপাসনা মন্দির, চৈত্য, ভিক্ষুশালা, দেশনাঘর, চংক্রমণ কুটির, ভিক্ষুসীমা, ভোজনালয়, পাঠ্যাগার, জাদুঘর, বয়নশালা, ভিক্ষু উপগৃহের মূর্তি,



রাত্তামাটি রাজবন বিহার

সম্পর্কের প্রতীক, বৌধিবৃক্ষ প্রভৃতি রয়েছে। বিহারটির নির্মাণশেলী অপূর্ব। পার্বত্য চন্দ্রগামে বন বিহারের ঘাটের অধিক শাখা আছে এবং বনভঙ্গের শিষ্য-প্রশিষ্যের সংখ্যা সহস্রাধিক। তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ধৃতাঞ্জাশীল পালন করেন। বৌদ্ধদের নিকট এই বিহারটি তীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত। এ তীর্থস্থানে প্রতিদিন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে জনগণ এই বিহারে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করতে আসেন। এছাড়া দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এ বিহারে সন্তানের অন্নপ্রাশন, সজ্জদান, অষ্টপরিক্ষার দান, কঠিন চীবরদান প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান করতে আসেন।

এ বিহারে পূর্ণিমা তিথিতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাঁকজমকপূর্ণভাবে বৃক্ষ পূর্ণিমা, ১০^০ কঠিন চীবর দান এবং বনভঙ্গের জন্মদিন পালন করা হয়। কঠিন চীবরদানের সময় চবিশ ঘন্টার মধ্যে তুলা ১০^১ থেকে সুতা কেটে, রং করে, কোমর তাঁতে বুনে, সেলাই করে চীবর তৈরি করা হয়। এই দৃশ্য খুবই

চমৎকার। চাকমা রাজমাতা বা চাকমা রানি দিনের শুরুতে সুতা কাটা উদ্বোধন করেন এবং দিনের শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্ম দেশনা প্রদানের পর চাকমা রাজা তৈরিকৃত চীবর দান করেন। এদিন প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। তখন বিহারটি একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। বনভঙ্গে এবং রাজবন বিহারের খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক এবং ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণ রাজবন বিহার দর্শন করতে আসেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে এই বিহারের আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাজবন বিহার অঞ্চলে অবস্থিত স্থাপনাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কঠিন চীবরদানের সময় রাজবন বিহারে কীভাবে চীবর তৈরি করা হয় তা বর্ণনা কর।

পাঠ : ৬

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফল ও সংরক্ষণ

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফল অনেক। দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করলে ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। মন উদার হয়। দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় অনুভূতির বিকাশ ঘটে। দর্শনীয় স্থান ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বাস্তব ধারণা সৃষ্টি হয়। দেশের সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষায় প্রেরণা জাগে। তাই সময় পেলে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং শিক্ষকের সঙ্গে দর্শনীয় স্থানসমূহ ভ্রমণ করা উচিত।

দর্শনীয় স্থানসমূহ জাতীয় সম্পদ। এগুলো দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধরে রাখে। বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরে। পর্যটন শিল্প হিসেবে রাজস্ব আয় করে। তাই দর্শনীয় স্থানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের সবার।

বিভিন্ন কারণে দর্শনীয় স্থানসমূহ ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। যেমন: সংরক্ষণের অভাব, অযত্ন, নদীভাঙ্গন, বন্যা, বাড়-বৃষ্টি, তুফান, পশু-পাখির মল ত্যাগ, কীটপতঙ্গের উপন্দুর, অপ্রয়োজনীয় লতা-পাতা, গাছ-পালা জন্মে বা উষ্ণিদজ্ঞাত সংক্রমণ, বায়ুদূষণ, অজ্ঞ মানুষের অহেতুক কৌতুহল, লুটেরাদের দৌরাত্য, যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কারণে দর্শনীয় স্থানগুলো ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। তাই ওপরে বর্ণিত কারণে যাতে দর্শনীয় স্থানগুলোর ক্ষতি না হয়, সে জন্য যথাযথ কৃতপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। দর্শনীয় স্থানের চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। দেখাশুনার ব্যবস্থা করতে হবে। সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য সর্ব সাধারণকে সচেতন ও উদ্বৃদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের অঞ্চলী ভূমিকা থাকা দরকার।

অনুশীলনমূলক কাজ

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফলগুলো লেখ।
দর্শনীয় স্থান ধ্বংসের কারণগুলো লিপিবদ্ধ কর।
দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বাংলাদেশে প্রচুর বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও ----- স্থান আছে।
২. বিহারগুলো মনোরম ----- পরিবেশে অবস্থিত।
৩. শালবন মহাবিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম চর্চার -----।
৪. কক্রবাজার জেলার রামু উপজেলায়----- বিহার অবস্থিত।
৫. ----- সালে রাঙামাটি শহরে রাজবন বিহার স্থাপিত হয়।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে	পোড়ামাটির ফলকচিত্রে অলঙ্কৃত ছিল।
২. বিহারের দেয়ালগাত্র অপূর্ব	এখানে একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করেন।
৩. পাল বংশের রাজা ধর্মপাল	চাকমা রাজা চীবরদান করেন।
৪. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্ম দেশনা প্রদানের পর	সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারগুলোর নাম লিখ।
২. সোমপুর মহাবিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. শালবন মহাবিহারে আবিস্কৃত তাত্ত্বিক ও ধ্বংসাবশেষ থেকে কী কী ধারণা পাওয়া যায়? আলোচনা কর।
৪. রামকোট বিহারের শিলালিপি সম্পর্কে ধারণা দাও।
৫. রাজবন বিহারে কী কী অনুষ্ঠান পালন করা হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দর্শনীয় স্থান হিসেবে ময়নামতি সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
২. কঠিন চীবরদান কী? একটি কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।
৩. পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ কী? আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সোমপুর মহাবিহারে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য কয়টি কক্ষ ছিল?

- | | |
|--------|--------|
| ক. ১১০ | খ. ১১৫ |
| গ. ১৬৮ | ঘ. ১৭৭ |

২. ময়নামতি বিখ্যাত হওয়ার অন্যতম কারণ কোনটি?

- ক. বৌদ্ধ নির্দশন আবিষ্কৃত হওয়ায়
- খ. শালবন মহাবিহারের সৌন্দর্যের জন্য
- গ. তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিতির জন্য
- ঘ. ধর্মচর্চার কেন্দ্রের জন্য

নিচের অনুচ্ছেটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কল্যাণমিত্র চৌধুরী পার্বত্যাঞ্চলের একটি বিহার দর্শনের জন্য যান। বিহারটির নির্মাণশৈলী তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি আরও মুগ্ধ হন উক্ত বিহারের পাঠাগার, বোধিবৃক্ষ, বয়নশালা ও উপাসনালয় দর্শন করে। তিনি আরও জানতে পারেন, উক্ত বিহারটি বৌদ্ধদের নিকট পুণ্যতীর্থ হিসেবে পরিচিত।

৩. কল্যাণমিত্র চৌধুরীর দর্শনীয় বিহারটি কোন বিহারের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. আনন্দ বিহার | খ. মেট্রী বিহার |
| গ. রাজবন বিহার | ঘ. রাজবিহার |

৪. বৌদ্ধধর্মে উক্ত বিহারের গুরুত্ব রয়েছে—

- i. দেশে-বিদেশে সুখ্যাতির কারণে
- ii. প্রাচীন ধর্মসাবশেষ থাকার কারণে
- iii. অন্যতম তীর্থস্থান হওয়ার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. জ্ঞানাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারের উপাসক-উপাসিকারা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধস্থান দর্শনের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তক্রমে তাঁরা নির্ধারিত সময়ে একটি বিহার দর্শনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে বিহারটির ধর্মসাবশেষ দেখতে পান। তাঁরা আরো লক্ষ্য করেন বিহারটিতে ১১৫টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষ পুরু দেয়ালে পৃথক রয়েছে। এছাড়া বিহারের গাত্রের দেয়াল সারি সারি পোড়ামাটির চিত্রে অলঙ্কৃত। উক্ত বিহার দর্শন করে সবাই মুগ্ধ হলেন।

- ক. পাল বৎশের কোন রাজা সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন?
- খ. দর্শনীয় স্থানসমূহ প্রমণ করা উচিত কেন?
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাসক-উপাসিকারা কোন ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করেছেন? বর্ণনা কর।
- ঘ. ‘দর্শনীয় স্থানটি বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে’—পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২.

ঘটনা-১

দিলীপ মুৎসুদি স্বদেশে ফিরে এসে রাঙ্গামাটি বৌদ্ধ বিহারে অন্তপরিষ্কার দান করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি বিহারে উপস্থিত হয়ে যথাসময়ে দানকার্য সম্পাদন করনে। তিনি ঘুরে ঘুরে উক্ত বিহারে বয়নশালা, ভোজনালয়, ভিক্ষু উপগুপ্তের মূর্তি, সঙ্গস্বর্গের প্রতীক, বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি দর্শন করেন।

ঘটনা-২

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মিতায়ন চাকমা কল্পবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যান। তারা কল্পবাজার প্রধান সড়কের প্রায় দু'মাইল পূর্বে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত একটি বিহারে যান। উক্ত বিহারটি সতেরটি ছোট-বড় পাহাড় দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেষ্টিত।

- ক. পাহাড়পুর কোন জেলায় অবস্থিত?
- খ. দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায় সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- গ. ঘটনা-১ -এর সাথে কোন বিহারটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ঘটনা-২ রামকোট বিহারের প্রতিচ্ছবি বিশ্লেষণ কর।

বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান : রাজা বিষিসার

বুদ্ধের সময়কালে প্রাচীন ভারতবর্ষ ছোট ছোলটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজ্যের রাজারা ছিলেন অনেক ক্ষমতাধর। রাজার ইচ্ছাতেই রাজ্যের সব কাজ পরিচালিত হতো। এ রাজাদের অনেকের সাথে গৌতম বুদ্ধের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। এ সময় অনেক রাজা বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ গ্রহণ করে রাজ্যে অপ্রয়োজনে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এমনকি পূজার নামে বা যজ্ঞের নামেও পশু হত্যা অনেক রাজ্যে নিষিদ্ধ ছিল। জনকল্যাণে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে বুদ্ধ রাজাদের উপদেশ দিতেন। অনেক রাজা বুদ্ধের গৃহী শিষ্য বা উপাসক ছিলেন।

এ রাজাদের অনেকেই গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচার ও প্রসারে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটি রাজন্যবর্গের অবদান নামে স্বীকৃত। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মগধের রাজা বিষিসার।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান শুদ্ধাচিত্তে ঘরণযোগ্য। এ অধ্যায়ে আমরা রাজা বিষিসার সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * রাজা বিষিসারের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- * বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে রাজা বিষিসারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

রাজা বিষিসার

বিষিসার ছিলেন মগধ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা। গৌতম বুদ্ধের সময়ে যে ষোলটি জনপদ বা রাজ্যের কথা জানা যায়, তার মধ্যে মগধ খুবই শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। বর্তমানকালের ভারতের বিহার রাজ্যই ছিল মগধ রাজ্য। এই রাজ্যের মাটি উর্বর ছিল এবং প্রচুর ফসল হতো। এ রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হিরণ্যবর্তী বা শোন নদী।

বিষিসার ছিলেন হর্ষক বংশের খ্যাতিমান নৃপতি। তাঁর নামের সাথে ‘শেণিয়’ বা ‘শ্রেণিক’ বিশেষণ যুক্ত হয়ে তিনি ‘মগধরাজ শ্রেণিক বিষিসার’ নামে খ্যাত ছিলেন। এটি ছিল তাঁর বংশের উপাধিবিশেষ। রাজা বিষিসারের রাজ্যাভিষেকের সঠিক সময় জানা যায় না। ধারণা করা হয় যে, গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের আনুমানিক ষাট বছর আগে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বিষিসারের রাজত্বকাল থেকেই মগধের অগ্রগতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল।

বিষিসারের জীবনকথা

বিষিসারের পিতার নাম ছিল ভট্টির বা মহাপদ্ম। অঙ্গরাজ্যের রাজা ব্রহ্মদত্ত একদা বিষিসারের পিতা রাজা মহাপদ্মকে পরাজিত করেছিলেন। বিষিসার পনের বছর বয়সে রাজা হন। রাজা হয়ে তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে অঙ্গরাজ্য দখল করে নেন। তার পর থেকে মগধ রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। রাজা বিষিসার অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর সৈন্যবাহিনী খুব পারদর্শী ছিল। যুদ্ধে তিনি হাতি ব্যবহার করতেন। ফলে তিনি সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। তাঁর রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জানা যায়, তাঁর রাজ্যে আশি হাজার শহর ছিল। শহরগুলোর মধ্যে তিনি সুন্দর যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। কোশল রাজ্যের রাজকুমারীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি কোশল, বৈশালী, গান্ধার, অবস্তা প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজা বিষিসার প্রাচীন রাজগৃহ নগরী নির্মাণ করেছিলেন। রাজগৃহ পাঁচটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখানে ছিল তাঁর রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের চারদিক পাথরের প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। রাজগৃহে বুদ্ধ অনেকদিন বসবাস করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন। এখানে প্রথম ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছিল। এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। রাজগৃহের নিকটেই অবস্থিত ছিল নালন্দা।

রাজা বিহিসার সুশাসক ছিলেন। তিনি ন্যায়ের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। সব সময় প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। বিহিসারের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র অজাতশত্রু রাজা হন। পরে দেবদণ্ডের প্ররোচণায় অজাতশত্রু পিতৃবিরোধী হয়ে উঠেন। একসময় তিনি পিতাকে কারাবুন্ধ করেন। তাঁকে খাবার দেয়া বন্ধ করে দেন। বিহিসার কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ষষ্ঠি বছর।

রাজা বিহিসার অন্য রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় রাজা ও উন্নত সংগঠক। পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্যের রাজারাও তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন। গান্ধারের রাজা পুকুরসাতি তাঁর কাছে দৃত পাঠিয়েছিলেন। অবঙ্গীরাজ প্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্য তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবককে প্রেরণ করেছিলেন। জীবক ছিলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক।

রাজা বিহিসারের রাজ্যে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েই সমসাময়িককালে বিকাশ লাভ করেছিল। মহাবীর জৈন, গৌতমবুদ্ধ এবং রাজা বিহিসার প্রায় সমকালীন ব্যক্তিত্ব। রাজা বিহিসার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও জৈনধর্মসহ সে সময়ে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি নিয়মিত রাজ্য পরিদর্শন করতেন। গ্রামের শাসক গ্রামিকদের সাথে তিনি সব সময় মতবিনিময় করতেন। কথিত আছে, তিনি আশি হাজার গ্রামিকের ওপর ভিত্তি করে রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজ্যের রাষ্ট্র-ঘাট ও বাঁধ নির্মাণ এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ
বিহিসারের জীবনকাহিনী লেখ।

পাঠ : ২

বুদ্ধ ও রাজা বিহিসার

বুদ্ধত্ব লাভের আগেই রাজা বিহিসারের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বোধিজ্ঞান লাভের জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করছিলেন। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে প্রথমে তিনি অনুপ্রিয় নামক আমবাগানে পৌছান। সেখানে তিনি অস্তক মুগ্ন করেন। তারপর কাষায় বন্ধ পরিধান করে সন্ধ্যাস্বত্ত্ব ধারণ করেন। এ সময় তিনি ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। পায়ে হেঁটে তিনি এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্য যেতেন। এভাবে তিনি বৈশালী থেকে রাজগৃহে পৌছান। উপযুক্ত গুরুর সন্ধান ও ভিক্ষান্ন সংগ্রহই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সৌম্য-শান্ত অপূর্ব সুন্দর এক যুবক ভিক্ষা করছেন। রাজগৃহের নগররক্ষীরা তাঁকে দেখে অবাক হন। এ খবর তারা পৌছে দেন রাজা বিহিসারের কাছে। রাজ প্রাসাদ থেকেই রাজা বিহিসার তাঁকে দেখতে পান। রাজা নিজে এসে তাঁর সাথে দেখা করে ভিক্ষা করার কারণ জানতে চাইলেন। রাজা তাঁকে এই কঠিন ব্রত ছেড়ে রাজসুখ ভোগ করার আহ্বান জানান। সেনাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তখন সিদ্ধার্থ রাজা বিহিসারকে বলেন, ‘মহারাজ! আমি সুখপ্রাপ্তি নই। আমি কপিলাবন্ধুর রাজা শুদ্ধেদনের পুত্র। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি সবকিছু ত্যাগ করে সন্ধ্যাস্বত্ত্ব গ্রহণ করেছি।’ রাজা বলেন, ‘বৎস! আপনার পিতা আমার পরম মিত্র। আপনার উদ্দেশ্য জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন আমাকে একবার দর্শন দেবেন। আমি আপনার সেবা করব, আপনাকে বন্দনা করব।’ রাজা বিহিসারের কথায় সিদ্ধার্থ সম্মতি প্রদান করে সেখান থেকে বের হয়ে যান।

রাজা বিহিসারের সঙ্গে বুদ্ধের আবার দেখা হয় বুদ্ধত্ব লাভের পর। তখন বুদ্ধ রাজগৃহের লটার্টি বন উদ্যানে বসবাস করছিলেন। তার দুই বছর আগেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। লোকমুখে তাঁর যশ-খ্যাতির কথা শুনে রাজা বিহিসার তাঁর সাথে দেখা করেন। বিহিসার ভগবান বুদ্ধের কাছে নতুন ধর্মের বাণী শোনার প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে দান, শীল ও স্বর্গ সম্বন্ধে সরলভাবে ধর্মোপদেশ দান করেন। তারপর, চতুর্বার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে উপদেশ দেন।

রাজা বিষিসার বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ শুনে মুগ্ধ হন। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিয় বা উপাসক হন। এ সময় রাজা বিষিসারের বয়স হয়েছিল উন্ত্রিশ বছর। সে সময় রাজা বিষিসার ভিক্ষুসভাসহ বুদ্ধকে রাজপ্রাসাদে নিমত্তণ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বুদ্ধ নিমত্তণ গ্রহণ করে প্রাসাদে গিয়ে রাজাকে নানা ধর্মকথা শোনান। রাজা ধর্মকথা শুনে আনন্দচিত্তে বুদ্ধকে বললেন, ‘প্রভু! ছেটকালে আমার পাঁচটি কামনা ছিল। তা আজ পূর্ণ হলো।’ কামনাগুলো হলো :

১. আমি ভবিষ্যতে রাজপদে অভিষিক্ত হব।
২. আমার রাজ্যে অর্হৎ সম্যকসমুদ্ধ অবতীর্ণ হবেন।
৩. আমি সেই বুদ্ধকে সেবা ও পরিচর্যা করব।
- ৪ সেই ভগবান বুদ্ধ আমাকে ধর্মোপদেশ দান করবেন।
৫. আমি বুদ্ধের ধর্ম উপলব্ধি করব।

তারপর রাজা বিষিসার অত্যন্ত শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁর রাজ্যের অতি মনোরম বেন্বন উদ্যান বুদ্ধ এবং তাঁর ভিক্ষুসভকে দান করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিষিসারের সঙ্গে বুদ্ধের কথন এবং কীভাবে সাক্ষাৎ হয়?

রাজা বিষিসারের কামনাগুলো লেখ (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৩

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বিষিসারের অবদান

বুদ্ধের উপাসক হওয়ার পর থেকে রাজা বিষিসার নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করতে থাকেন। তিনি ছত্রিশ বছর বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের সেবা করেন। তিনি মগধের অধিবাসীদের ধর্ম দেশনা করার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধে মগধবাসীর উদ্দেশে ধর্ম দেশনা করেন। সেই সময় থেকে ভিক্ষুসভ কর্তৃক গৃহীদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়।

এ সময় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে সমবেতভাবে ধর্ম আলোচনা করতেন। সাধারণ লোকেরা তাঁদের নিকট ধর্মকথা শুনতেন। তাঁদের ধর্মে দীক্ষা নিতেন। রাজা বিষিসার এসব লক্ষ্য করে ভিক্ষুদেরও ঐ সব তিথিতে ধর্ম আলোচনার সুযোগ দিতে বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। বুদ্ধ ভিক্ষুদের উপোসথ পালন ও ধর্ম আলোচনার নির্দেশ দেন। রাজা বিষিসারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন জীবক। তিনি খুবই বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। রাজার আদেশে তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসভের চিকিৎসা করতেন। তাঁদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন।

ভিক্ষুরা আগে পুরাতন ও পরিত্যক্ত কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে সেলাই করে পরিধান করতেন। এতে ভিক্ষুদের অনেক রকম রোগ হতো। চিকিৎসক জীবক ভিক্ষুদের নীরোগ জীবন চিন্তা করেন এবং নতুন কাপড় পরিধানের অনুমতি প্রদানের জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ জীবকের আবেদন মঞ্জুর করে ভিক্ষুদের নতুন কাপড় পরিধানের বিধান দিয়েছিলেন। এর পর থেকে রাজা বিষিসারও ভিক্ষুদের নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কাপড় দান করতেন। এভাবে রাজা বিষিসার বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজা বিষিসার বুদ্ধকে কী কী অনুরোধ করেছিলেন?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বুদ্ধ জনকল্যাণে দায়িত্বশীল হতে উপদেশ দিতেন।
২. ছিলেন মগধ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা।
৩. বিষিসারের পিতার নাম বা।
৪. রাজগৃহের অদূরে অবস্থিত।
৫. বিষিসারের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র রাজা হন।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বিষিসারের রাজত্বকাল থেকেই	ভিক্ষুদের নীরোগ জীবন চিন্তা করেন।
২. গ্রামের শাসক গ্রামিকদের সাথে	তিনি সব সময় মতবিনিময় করতেন।
৩. রাজগৃহ	মগধের অগ্রগতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল।
৪. রাজা বিষিসার বুদ্ধের	বাণী ও উপদেশ শুনে মুগ্ধ হন।
৫. চিকিৎসক জীবক	পাঁচটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিষিসার কে ছিলেন?
২. জীবক কে ছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. রাজা বিষিসারের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. রাজা বিষিসার কীভাবে বুদ্ধের অনুরাগী হয়েছিলেন বর্ণনা কর।
৩. বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজা বিষিসারের অবদান আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জীবক কোন রাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. শুন্দেরাদন | খ. অশোক |
| গ. বিষিসার | ঘ. অজাতশত্ৰু |

২. রাজা বিষিসার সুশাসক হওয়ার কারণ, তিনি—

- i. প্রজাদের ভালোবাসতেন
- ii. ন্যায়ের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন
- iii. যুদ্ধের কোশল জানতেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কানাইমাদারী গ্রামের উপাসিকা পুষ্পরাণি বড়ুয়া নিজ গ্রামে একটি বিহার নির্মাণ করেন। বিহারটি তিনি ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশে উৎসর্গ করে দান করার সিদ্ধান্ত নেন। এ উপলক্ষে ঐ গ্রামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শ্রদ্ধেয় ভক্তে দেশনাকালে ঐতিহাসিক বেনুবন উদ্যান দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এ ধরনের কাজ সন্দর্ভে উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

৩. পুষ্পরাণি বড়ুয়ার কর্মটি ধর্মীয় দৃষ্টিতে বলা যায়—

- i. ধর্ম প্রচার ও প্রসারে অবদান
- ii. ভিক্ষুসংঘের সেবা দান
- iii. পুণ্যাংশ অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

৪. পুষ্পরাণি বড়ুয়ার কর্মে বিহিসারের কোন চেতনা প্রেরণা যুগিয়েছে?

- | | | | |
|----|-----------------|----|----------------|
| ক. | শ্রদ্ধা চিন্তের | খ. | আভরিকতার |
| গ. | সেবা করার | ঘ. | খ্যাতি অর্জনের |

সূজনশীল প্রশ্ন

‘নিরুমপুর শহরের রক্ষীরা মেয়ারকে গিয়ে বললেন’ গভীর বনে জনৈক সৌম্য, শান্ত ও সুন্দর শ্রমণ ভাবনা করছেন। মেয়ার উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানতে চান। উত্তরে তিনি বললেন, সংসার-দুঃখ থেকে মুক্তির আশায় এ পথ বেছে নিয়েছেন। বিষয়টি জেনে মেয়ার খুব খুশি হলেন। পরবর্তী সময়ে উক্ত শ্রমণের যেন কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়; মেয়ার সেদিকে নজর রাখতেন। শ্রমণ যখন মার্গফল লাভ করলেন, তখন বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মেয়ার বিহার নির্মাণ করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেন।

- ক. বিহিসার কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
- খ. সিদ্ধার্থ ও রাজা বিহিসারের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতে কী আলোচনা হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় রাজা বিহিসারের জীবনের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মেয়ারের মতে ব্যক্তিরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে মতামত দাও।

২০২০
শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ-বৌদ্ধধর্ম

সকল প্রাণী সুখী হোক
– গৌতম বুদ্ধ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন – দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য